Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধি

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আয়েশা সিদ্দিকা জান্নাত

রোলঃ 23090120304

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধি

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আয়েশা সিদ্দিকা জান্নাত

রোলঃ 23090120304

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধি " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আয়েশা সিদ্দিকা জান্নাত, আইডিঃ 23090120304 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধি " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Ayesha

(স্বাক্ষর)

আয়েশা সিদ্দিকা জান্নাত

আইডিঃ 23090120304

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধি 6

আত্মশুদ্ধি কী? 6

নফস ও ক্বলব 7

আত্মশুদ্ধির লক্ষ্য 7

তাযকিয়া, তাসাওউফ ও ইহসান 7

আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব 9

কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে আত্মশুদ্ধি 11

কুরআনে আত্মশুদ্ধি 11

হাদিসে আত্মশুদ্ধি 13

আত্মশুদ্ধির স্তর ও প্রক্রিয়া 16

আত্মশুদ্ধির ফলাফল 17

নফসের বিভিন্ন অবস্থা 18

আত্মশুদ্ধি অর্জনে করণীয় 19

মানসিক ও দৈহিক কর্ম 21

আত্মশুদ্ধি অর্জনের উপায় 35

তাসাওউফ পর্যালোচনা 39

তাসাওউফ কী ও কেন? 39

তাসাওউফের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ 40

মাধ্যম ও উপকরণ 41

তাসাওউফ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ও অপপ্রচার 42

উপসংহার 48

ভূমিকা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। মানবজীবনের সাথে সম্পৃক্ত সকল কিছুর বিধি-বিধান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। মানুষের দুটি দিক আছে- বাহ্যিক দিক এবং অভ্যন্তরীণ বা আত্মিক দিক। অর্থাৎ, বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তথা শরীর বা দেহ এবং আত্মার সমন্বয়ই হলো মানুষ। স্বাভাবিকভাবেই, ইসলাম মানুষের বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ উভয় দিকের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। অর্থাৎ, ইসলাম যেমন আমাদের বাহ্যিক দেহ বা শরীর সম্পর্কে কিছু বিধিবিধান নির্ধারণ করে দিয়েছে, তেমনই আমাদের আত্মার সাথে সম্পৃক্ত বিধিবিধান ও আছে।

মানুষের বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তথা শরীরের সাথে সম্পৃক্ত শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত ও মুস্তাহাব এবং হারাম, মাকরুহ ইত্যাদি বিধান

যেমন রয়েছে। তেমনিভাবে আত্মার সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন পর্যায়ের যেমন - ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত ও মুস্তাহাব এবং হারাম, মাকরুহ ইত্যাদি বিধানও আছে। কিন্তু, দুঃখজনকভাবে সাধারণ মুসলমান তো বটেই দ্বীনদারদের মধ্যেও আত্মিক বিধিবিধান মেনে চলার ক্ষেত্রে বেশ উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয়। কারণ, আত্মার সাথে সম্পৃক্ত বিধিবিধান আমাদের অনেকেরই জানা নেই অথবা জানা থাকলে তার চর্চায় সচেষ্ট হই না।

আত্মা বা রুহহীন শরীরকে মানুষ বলা হয় না, লাশ বলা হয়। এ থেকেই বুঝা যায়, কেন আত্মা বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এর চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ

বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন

(নুমান ইবনু বশির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত),

أَلاَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ "كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ .أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ"

অর্থ: "জেনে রাখ, শরীরের মধ্যে একটি গোশতের টুকরা আছে, তা যখন ঠিক হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন ঠিক হয়ে যায়। আর তা যখন খারাপ হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখ, সে গোশতের টুকরোটি হল ক্বলব (অন্তর)।" (২০৫১; মুসলিম ২২/২০ হাঃ ১৫৯৯, আহমাদ ১৮৩৯৬, ১৮৪০২)

সুতরাং বুঝা যায়, মানুষের শরীর বা বাহ্যিক দিকের ভালো-মন্দ আত্মার উপর নির্ভর করে। তাই আত্মার নিবিড় পরিচর্যা করা জরুরি। অন্তর যদি পরিশুদ্ধ হয় এবং এর

কার্যক্রম ঠিকভাবে হয়, অন্তরের রোগের যদি সঠিক চিকিৎসা হয় তবে মানুষের বাহ্যিক দিক ও সুস্থ-শুদ্ধ থাকবে। ইসলামের বাহ্যিক আমলগুলোর শুদ্ধতাও অন্তরের হালতের উপর

নির্ভর করে। অন্তর বিশুদ্ধ না হলে বাহ্যিক আমলও শুদ্ধ হয় না। প্রত্যেক মুমিন-মুসলিমের তাই উচিত আত্মাকে সুস্থ-সবল-পরিশুদ্ধ রাখার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা। আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার মাধ্যমেই শুধুমাত্র আল্লাহর পূর্ণ সন্তুষ্টি, প্রকৃত সফলতা অর্জন করা সম্ভব। ব্যক্তির মাঝে 'তাযকিয়াতুন নফস' বা আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধি সাধন করা ইসলামের মৌলিক লক্ষ্য। ইসলামের সকল নিয়মতান্ত্রিক ইবাদত সমূহ একই লক্ষ্যে নিবেদিত।
বলা যায় আত্মশুদ্ধিতার উপরই নির্ভর করে মানুষের যাবতীয় কার্যক্রম ও তার ফলাফল।

তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধি

আত্মশুদ্ধি কী?

আরবি তাযকিয়াহ - تزكية শব্দটি زكّي শব্দ/ক্রিয়াপদ থেকে এসেছে। যার শাব্দিক অর্থ পরিশুদ্ধ করা, পবিত্র করা, বৃদ্ধি পাওয়া বা উন্নত করা।
পারিভাষিকভাবে, তাযকিয়া বলতে ব্যক্তির শিরক-বিদআত ও অন্যান্য পাপ সহ সকল প্রকার মন্দ, কলুষতাপূর্ণ কাজ বা বিষয়াবলি থেকে বিরত থেকে বা মুক্ত হয়ে অন্তরকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করা/রাখা এবং উত্তম-সুন্দর গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে আত্মাকে সজ্জিত করাকে বুঝায়।
অর্থাৎ আত্মাকে পাপ, মন্দ কাজ বা গুণাবলি ও নফসের কুপ্রবৃত্তি থেকে মুক্ত করে আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, নেক আমল ও উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে অন্তরকে সৌন্দর্য ও পূর্ণতা দানের চেষ্টা বা আত্মিক উন্নতি সাধন করাকে *'তাযকিয়াতুন নফস'* বা *'আত্মশুদ্ধি'* বলে।
পরিভাষাটির অন্যান্য নিকটবর্তী ব্যবহৃত সমার্থক শব্দ হল ইসলাহ-ই ক্বলব , ইখলাস , কালবি সালিম, ইহসান ও তাহারাত। পরবর্তী যুগে একটি মতবাদ হিসেবে ব্যবহৃত সমার্থক শব্দ হল তাসাউফ (সুফিবাদ)।
মানুষ কেবল রক্ত-মাংসের দেহ নয়, বরং তার মধ্যে রয়েছে এক আত্মা বা 'নফস'। দেহের যেমন রোগ হয়, তেমনি আত্মাও পাপ, কুপ্রবৃত্তি ও খারাপ অভ্যাসে আক্রান্ত হয়ে কলুষিত হতে পারে। এই আত্মিক ব্যাধি থেকে মুক্তি এবং আত্মাকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় জীবনে সফলতা অর্জনই তাযকিয়ার উদ্দ্যেশ্য। এটি মূলত নফসকে (আত্ম-প্রবৃত্তি) প্রবৃত্তি-কেন্দ্রিক দশা থেকে আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণের অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার একটি ধারাবাহিক ও জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া।

'নফস' হলো মানুষের প্রবৃত্তি ও কামনা, এবং ' ক্বলব' হলো হৃদয় বা অন্তর।

নফস ও ক্বলব

'নফস' হলো মানুষের প্রবৃত্তি ও কামনা, এবং ' ক্বলব ' হলো হৃদয় বা অন্তর।
নফসের আভিধানিক অর্থ আত্মা বা সত্তা; পারিভাষিকভাবে নফস বলতে মানুষের প্রবৃত্তি, কামনা-বাসনা বা আত্মিক শক্তিকে বোঝায়। এটিই মানুষের বিভিন্ন কাজের মূল চালিকাশক্তি।
আবার, ক্বলবের আভিধানিক অর্থ হৃদয় বা অন্তর; পারিভাষিকভাবে ক্বলব সেই আধ্যাত্মিক কেন্দ্র যেখানে ঈমান ও কুফর, ভালো ও মন্দ, এবং আল্লাহ্ সম্পর্কিত জ্ঞান ও অনুভূতি সংরক্ষিত থাকে। 'তাযকিয়া' প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই ক্বলবকে পরিশুদ্ধ করা হয়।
'তাযকিয়া' শব্দের অর্থ হলো পবিত্রকরণ বা আত্মশুদ্ধি। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে 'নফস' বা আত্মা, ' ক্বলব ' বা হৃদয়কে কলুষমুক্ত করে পরিশুদ্ধ করা হয়। এই প্রক্রিয়াটিকেই আরবি পরিভাষায় তাযকিয়াতুন নফস বা সংক্ষেপে তাযকিয়া(আত্ম শুদ্ধি) বলা হয়। এর মূল লক্ষ্য হলো অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা ও চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধন করা, যা আল্লাহ্র আনুগত্য এবং তাঁর রাসুলের সুন্নাহ অনুসরণের মাধ্যমে সম্ভব হয়।

আত্মশুদ্ধির লক্ষ্য

তাযকিয়া হলো আত্মার উন্নতির সেই চলমান প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর একজন প্রকৃত বান্দা হিসেবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। তাযকিয়ার মূল লক্ষ্য হলো:
আত্মপর্যালোচনা: নিজের ভুলত্রুটি, পাপ এবং চারিত্রিক দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করা।
পরিশুদ্ধি: চিহ্নিত দুর্বলতাগুলো দূর করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মন ও আত্মাকে পবিত্র করা।
নৈতিক উন্নয়ন: ভালো গুণাবলী অর্জন করা এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা।
আল্লাহর নৈকট্য: আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ মানা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ মেনে চলার মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভ করা।

তাযকিয়া, তাসাওউফ ও ইহসান

তাযকিয়া, তাসাওউফ ও ইহসান একই উদ্দেশ্য সম্বলিত তিনটি পরিভাষা, যেগুলো ইসলামের আধ্যাত্মিক পথের সাথে সম্পর্কিত। যা আত্মশুদ্ধি এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের দিকে নির্দেশ করে।

যদিও এগুলোকে প্রায় সমার্থক শব্দ হিসেবে ধরা হয় ক্ষেত্রবিশেষে, তবে এগুলোর মধ্যে প্রয়োগ ও দৃষ্ট ভঙ্গিতে পার্থক্য এদের আলাদা করে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করে।

তাযকিয়া: তাযকিয়া বা তাযকিয়াতুন নফস(আত্মশুদ্ধি) একটি কুরআনিক পরিভাষা যার আভিধানিক অর্থ হলো পরিশুদ্ধ করা বা পবিত্র করা। ইসলামি পরিভাষায়, নফস(আত্মা বা প্রবৃত্তি)-কে কুপ্রবৃত্তি থেকে মুক্ত ও শুদ্ধ করে আল্লাহর প্রতি নিবেদিত করার প্রক্রিয়া হলো তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধি। কুরআন ও হাদীসে এই শব্দের ব্যবহার আছে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাযকিয়াকে সফলতার চাবিকাঠি হিসেবে অভিহিত করেছেন।

তাসাওউফ: তাসাওউফ হলো তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধি অর্জনের পদ্ধতি। এটি ইসলামের সেই অংশ যা হৃদয়, অন্তর এবং আধ্যাত্মিকতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। তাসাওউফের মূল লক্ষ্য হলো আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা, ভয়, ইখলাস এবং উত্তম চরিত্র অর্জন করা। সহজ কথায়, তাসাওউফ হলো আত্মশুদ্ধি(তাযকিয়া)-র বিজ্ঞান বা শাস্ত্র।

ইহসান: ইহসান হলো ইসলাম ধর্মের তিনটি মৌলিক স্তম্ভের একটি (অন্য দুটি হলো ঈমান ও ইসলাম) এবং এটি আধ্যাত্মিকতার সর্বোচ্চ স্তর বা ফলাফল। হাদীসে জিব্রাঈল নামক প্রসিদ্ধ হাদীসে ঈমান ও ইসলামের পূর্ণতাকে 'ইহসান' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর 'ইহসান'-এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এভাবে-

الله دبعت نأ ناكم ىشختت نأ : ةياور يفو .كارَيَ هَّنِإَف ،هارَت نُكَت مَل نِإَف ،هارَت كَّنَأَكَ َالله َدُبعَت نَأ

অর্থ : ইহসান ঐ মাকামকে বলে যে, তুমি আল্লাহ পাকের ইবাদত-বন্দেগী এমনভাবে করবে (অথবা সর্বদা তাকে এমনভাবে ভয় করবে) যেন তুমি তাকে দেখছ। কেননা, যদিও তুমি তাকে না দেখ, তিনি কিন্তু তোমাকে (সর্বক্ষণ, সর্বাবস্থায় ও সর্বস্থানে) দেখছেন। (৪৭৭৭; মুসলিম ১/১ হাঃ ৯) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৪৮, ইসলামী ফাউন্ডেশনঃ ৪৮)

তাযকিয়া ও তাসাওউফের মাধ্যমে অর্জিত পরিশুদ্ধির চূড়ান্ত ফলস্বরূপ এই 'ইহসান' নামক সচেতনতা ও আধ্যাত্মিক পূর্ণতা লাভ হয়।

সংক্ষেপে, তাযকিয়া হলো উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য (আত্মশুদ্ধি); তাসাওউফ হলো সেই উদ্দেশ্য অর্জনের পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া এবং ইহসান হলো তাযকিয়া ও তাসাওউফের চূড়ান্ত ফলাফল বা সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা।

আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব

তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধি অর্জন করা বা এর জন্য অব্যাহতভাবে চেষ্টা-সাধনা করা প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফরয। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা একাধিকবার তাযকিয়া(আত্মশুদ্ধি)র কথা উল্লেখ করেছেন।

সুস্থ দেহের ন্যায় সুস্থ্য আত্মার প্রয়োজনীতাও সমানরকম। বরং আত্মিক পরিশুদ্ধতা শারীরিক সুস্থতার চেয়েও বহুগুণ গুরুত্বপূর্ণ। একজন মুমীনের বৈশিষ্ট্যই হলো, সে আত্মাকে পরিশুদ্ধ রেখে দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা নিশ্চিত করার অনবরত চেষ্টা করবে। আপন আত্মাকে যতবেশি পবিত্র, পরিচ্ছন্ন রাখা যাবে তত বেশি আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে তা সহায়ক হবে।

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআ'লা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর দু'আর কথা উল্লেখ করেছেন। যেখানে নবুয়তের চারটি দায়িত্ব- তিলাওয়াত, তালিম(কিতাবের ও হেকমতের) ও তাযকিয়া(আত্মশুদ্ধি) এর কথা উল্লেখ করেছেন।
ইবরাহীম আলাইহিস সালামের এর দু'আ-

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

হে পরওয়ারদেগার! তাদের মধ্যে থেকেই তাদের নিকট একজন পয়গম্বর প্রেরণ করুণ যিনি তাদের কাছে তোমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দিবেন। এবং তাদের পবিত্র করবেন। নিশ্চয় তুমিই পরাক্রমশালী হেকমতওয়ালা।

উপরোক্ত সূরা বাকারার ১২৯ নং আয়াত ছাড়াও আরো তিন জায়গা যথাক্রমে সূরা বাকারার ১৫১ নং আয়াত, সূরা আলে-ইমরানের ১৬৪ নং আয়াত এবং সূরা জুমুআর ২ নং আয়াতে নবুয়তের দায়িত্বের বিবরণ রয়েছে। আর এই তিন আয়াতে দায়িত্বের বর্ণনা ধারাবাহিকতায় পরিবর্তন এনে তালিমের আগে তাযকিয়ার কথা বলা হয়েছে। সূরা জুমুআর ২ নং আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেন-

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তার আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।

অর্থাৎ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কুরআনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চারটি প্রধান দায়িত্বের একটি হিসেবে 'কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি 'তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধি'র কথা উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জন প্রতিটি মুসলমানের জন্য কত গুরুত্বপূর্ণ এবং তা ফরয বা বাধ্যতামূলক।

সুরা শামসে আল্লাহ তাআ'লা এগারোটি বিষয়ের কসম করে আত্মশুদ্ধির কথা উল্ল্যেখ করেছেন। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ চন্দ্র, সূর্য, দিবস-রাত্রি, আসমান-জমিন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বস্তুর কসম করে তাযকিয়াতুন নফস বা আত্মশুদ্ধির কথা ইরশাদ করেছেন এই সূরায়। খোদ আল্লাহ তা'য়ালাই যে বিষয়ের কসম করেন তার গুরুত্ব কেমন হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। এছাড়াও অত্যধিক গুরুত্বারোপ করার জন্য আরবীতে 'নিশ্চয়' শব্দ ব্যবহার করেছেন। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

اهاحُضوَ سِمْشْلاوَ

শপথ সূর্যের ও তার কিরণের,

اهلَاتَ اَذِإ رِمَقْلاوَ

শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্যের পশ্চাতে আসে,

اهلَّاجِ اَذِإ رِاهَّنلاوَ

শপথ দিবসের যখন সে সূর্যকে প্রখরভাবে প্রকাশ করে,

اهاَشْغَيِ اَذِإ لِيْلَّلاوَ

শপথ রাত্রির যখন সে সূর্যকে আচ্ছাদিত করে,

اهانَبِ امَوَ ءِامَّسلاوَ

শপথ আকাশের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন, তাঁর।

اهاحَط امَوَ ضِرْ َلْأاوَ

শপথ পৃথিবীর এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন, তাঁর,

اهاوَسد اموَ سِفْنوَ

শপথ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন, তাঁর,

اهاوْقتوَ اهرَوجُف اهمَهلْأف

অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন,

اهاَّكزَ نمَ حلْفَأ دَق

যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়। (সুরা শামস: ১-৯)

আত্মশুদ্ধি অর্জনকে ইসলামি শরীয়াহর মূল উদ্দেশ্য দিসেবে অভিহিত করা হয়। আমাদের যাবতীয় চেষ্টা-সংগ্রামের মূলই হচ্ছে আখেরাতের অনন্ত-অসীম জীবনে সফলতা লাভ করা, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। ইহলৌকিক ও পরলৌকিক উভয় জাহানে সফল জীবন গঠনে তাই আত্মশুদ্ধির কোনো বিকল্প নেই।

কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে আত্মশুদ্ধি

কুরআনে আত্মশুদ্ধি

উম্মতের পরিশুদ্ধি রিসালাত তথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণের উদ্দেশ্য:

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

যেমন, আমি পাঠিয়েছি তোমাদেরই মধ্য থেকে তোমাদের জন্যে একজন রসূল, যিনি তোমাদের নিকট আমার বাণীসমুহ পাঠ করবেন এবং তোমাদের পবিত্র করবেন; আর তোমাদের শিক্ষা দেবেন কিতাব ও তাঁর তত্ত্বজ্ঞান এবং শিক্ষা দেবেন এমন বিষয় যা কখনো তোমরা জানতে না। (সূরা বাকারা ২:১৫১)

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

আল্লাহ ঈমানদারদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নবী পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন। তাদেরকে

পরিশোধন করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও কাজের কথা শিক্ষা দেন। বস্তুতঃ তারা ছিল পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট। (সূরা আলে-ইমরান ৩:১৬৪)

আত্মশুদ্ধি অর্জনকারী সফলকাম:

قَدۡ اَفۡلَحَ مَنۡ تَزَکّٰی ★وَ ذَکَرَ اسۡمَ رَبِّہٖ فَصَلّٰی

নিশ্চয়ই সে সাফল্য লাভ করছে যে আত্মশুদ্ধি অর্জন করেছে। আর তার রবের নাম স্মরণ করেছে, অতঃপর সালাত আদায় করেছে। (সূরা আলা ৮৭:১৪-১৫)

আত্মশুদ্ধি অর্জনকারী সফলকাম আর আত্মাকে কলুষিতকারী ব্যর্থ:

قَدۡ اَفۡلَحَ مَنۡ زَکّٰىہَا★وَ قَدۡ خَابَ مَنۡ دَسّٰىہَا

নিঃসন্দেহে সে সফলকাম হয়েছে, যে তাকে পরিশুদ্ধ করেছে এবং সে ব্যর্থ হয়েছে, যে তার (নাফস)-কে কলুষিত করেছে। (সূরা শামস ৯২:৯-১০)

যাকাত গ্রহণের মাধ্যমে পরিশুদ্ধ করার নির্দেশ:

خُذۡ مِنۡ اَمۡوَالِہِمۡ صَدَقَۃً تُطَہِّرُہُمۡ وَ تُزَکِّیۡہِمۡ بِہَا وَ صَلِّ عَلَیۡہِمۡ ؕ اِنَّ صَلٰوتَکَ سَکَنٌ لَّہُمۡ ؕ وَ اللّٰہُ سَمِیۡعٌ عَلِیۡمٌ

তাদের সম্পদ থেকে সদাকা নাও। এর মাধ্যমে তাদেরকে তুমি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে। আর তাদের জন্য দো'আ কর, নিশ্চয় তোমার দো'আ তাদের জন্য প্রশান্তিকর। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা তওবা ৯:১০৩)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে পবিত্র করা:

ہُوَ الَّذِیۡ بَعَثَ فِی الۡاُمِّیّٖنَ رَسُوۡلًا مِّنۡہُمۡ یَتۡلُوۡا عَلَیۡہِمۡ اٰیٰتِہٖ وَ یُزَکِّیۡہِمۡ وَ یُعَلِّمُہُمُ الۡکِتٰبَ وَ الۡحِکۡمَۃَ * وَ اِنۡ کَانُوۡا مِنۡ قَبۡلُ لَفِیۡ ضَلٰلٍ مُّبِیۡنٍ

তিনিই উম্মীদের মাঝে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে, যে তাদের কাছে তেলাওয়াত করে তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করে এবং তাদেরকে শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমাত। যদিও ইতঃপূর্বে তারা স্পষ্ট গোমরাহীতে ছিল। (সূরা জুমআ ৬২:০২)

রাত্রি জাগরণ আত্নসংযমের জন্য অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ:

اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْأً وَّ اَقْوَمُ قِيْلًا

নিশ্চয় রাত-জাগরণ আত্মসংযমের জন্য অধিকতর প্রবল এবং স্পষ্ট বলার জন্য অধিকতর উপযোগী। (সূরা মুজ্জাম্মিল ৭৩:০৬)

কিয়ামত দিবসে নাজাতের উসিলা হবে বিশুদ্ধ অন্তর:

يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ★ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না। কেবল (সাফল্য লাভ করবে) সে ব্যক্তি যে বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে আল্লাহর নিকট আসবে। (সূরা আশ-শুয়ারা ২৬:৮৮-৮৯)

হাদিসে আত্মশুদ্ধি

আল্লাহ মানুষের বাহ্যিক চাল-চলনের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না বরং অন্তর এবং আমলের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন:

আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

" إِنَّ اللَّهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلاَ إِلَى صُوَرِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ " .

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের বাহ্যিক চাল-চলন ও বিত্ত-বৈভবের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না; বরং তিনি দৃষ্টি দিয়ে থাকেন তোমাদের অন্তর ও আমলের প্রতি। (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৬৪৩৭)

অর্থাৎ, আমাদের আমল ও কর্ম বাহ্যিকভাবে সংঘটিত হলেও মহান আল্লাহ মানুষের হৃদয় দেখেন ও নিয়তের বিশুদ্ধতা দেখেন। বাহ্যিক আমল যত ভালো হোক, হৃদয়ের পরিশুদ্ধতা বা ইবাদত একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য না হলে তা গ্রহণীয় নয়।

ক্বলব শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ:

নুমান ইবনু বশীর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে,

" إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ

َدَسَفَ اَذِاَوَ ،ُهُّلُكُ دَسَجْلَا َحَلَصَ تْحَلَصَ اَذِاَ ۚهَغْضُمُ دَسَجْلَا يِفَ نَّاِوَ َلاَأ ،ُهُمِراَحَمِ ِهِضْرَأ يِفِ َالله ىَمِحَ نَّاِ َلاَأ ، ُبْلَقْلَا َيِهَوَ َلاَأ .ُهُّلُكُ دَسَجْلَا َدَسَفَ تْ ".

অর্থ: হালালও স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। আর এ দু'য়ের মাঝে রয়েছে বহু সন্দেহজনক বিষয়- যা অনেকেই জানেনা। যে ব্যাক্তি সেই সন্দেহজনক বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে থাকবে, সে তার দ্বীন ও মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে। আর যে সন্দেহজনক বিষয়সমূহে লিপ্ত হয়ে পড়ে, উদহারন সে রাখালের ন্যায়, যে তার পশু বাদশাহ্‌র সংরক্ষিত চারণভুমির আশে পাশে চরায়, অচিরেই সেগুলো সেখানে ঢুকে পড়ার আশংকা রয়েছে। জেনে রাখ যে, প্রত্যেক বাদশাহ্‌রই একটি সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে। আরো জেনে রাখ যে, আল্লাহর যমীনে তাঁর সংরক্ষিত এলাকা হল তাঁর নিষিদ্ধ কাজসমূহ। জেনে রাখ, শরীরের মধ্যে একটি গোশতের টুকরা আছে, তা যখন ঠিক হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন ঠিক হয়ে যায়। আর তা যখন খারাপ হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখ, সে গোশতের টুকরোটি হল কলব। (২০৫১; মুসলিম ২২/২০ হাঃ ১৫৯৯, আহমাদ ১৮৩৯৬, ১৮৪০২)

অর্থাৎ, ভালো কিছুর প্রতি আকর্ষণ বা খারাপ বিষয়ের প্রতি আসক্তি প্রথমে অন্তরেই জাগ্রত হয়। তারপর মানুষ তা কর্মে পরিণত করে। অন্তর যদি পরিশুদ্ধ হয়, নেককাজের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়, বেশি বেশি সৎ আমল করা সম্ভব হয়। আর অন্তর কলুষিত হলে নানা কুমন্ত্রণা হৃদয়ে ভর করে। সবকিছুর মূলে রয়েছে অন্তর বা নফস।

পরিশুদ্ধ অন্তরের অধিকারীই সর্বোত্তম:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنَا مُغِيثُ بْنُ سُمَىٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَىُّ النَّاسِ أَفْضَلُ قَالَ " كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ صَدُوقِ اللِّسَانِ . " قَالُوا صَدُوقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ قَالَ " هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ لاَ إِثْمَ فِيهِ وَلاَ بَغْىَ وَلاَ غِلَّ وَ لاَ حَسَدَ. "

আবদুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলা হলো, কোন ব্যক্তি সর্বোত্তম? তিনি বলেনঃ প্রত্যেক বিশুদ্ধ অন্তরের অধিকারী সত্যভাষী ব্যক্তি। তারা বলেন, সত্যভাষীকে তো আমরা চিনি, কিন্তু বিশুদ্ধ অন্তরের ব্যক্তি কে? তিনি বলেন, সে হলো পূত-পবিত্র নিষ্কলুষ চরিত্রের মানুষ যার কোন গুনাহ নাই, নাই কোন দুশমনি, হিংসা-বিদ্বেষ, আত্মঅহমিকা ও কপটতা। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৪২১৬)

মুসলিম উম্মত আক্বীদা-বিশ্বাস, ইবাদত ও ব্যবহারিক প্রতিটি ক্ষেত্রে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার ধারক-বাহক। তাই কোন ধরনের অকল্যাণকর উপাদান যেন তার অন্তরকে বক্র করে না ফেলে বা সংকীর্ণতায় নিক্ষেপ না করে সেজন্য তাকে সদা সতর্ক থাকতে হয়।

মন্দ কাজের অনুবর্তীতে ভাল কাজ মন্দকে মুছে দেয়:

عُجْمَتَةَسَحْلَا َةَّيِّئَسلا ِعبْتَأَوَ تَنْكُ امُثَيْحَ اَللهِ قَّتا " ملسو هيلع الله ىلص اَللهُ لُوسَرَ يِلَ لاَقَ ،رٍّذَ يِبَأ نْعَ
" نِسَحٍ قُلُخِبِ سَانلا قِلاَخَوَ اه

আবূ যার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন যেখানেই থাকবে আল্লাহকে ভয় করবে; মন্দ কাজের অনুবর্তীতে কোন নেককাজ করে ফেলবে তাতে মন্দ অপসৃত হয়ে যাবে; মানুষের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করবে। (জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ১৯৮৭)

গুনাহ বা মন্দ কাজ আত্মার পরিশুদ্ধির পথে প্রতিবন্ধক। তাই গুনাহ হয়ে গেলে আত্মার উপর তার প্রভাব প্রশমিত করতে কোনো নেক কাজ করে ফেলা উচিত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্তরের পরিশুদ্ধি চেয়ে দু'আ করতেন:
যায়দ ইবনু আরক্বম (রাঃ) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন-

زَوَ اهاوْقَتْ ىسْفَنِ تااَمُهِّللَا رِبْقَلْا بِاَدْعَوَ مِرَهْلاَوَ لِخْبُلْاوَ نِبْجُلْاوَ لِسَكْلاَوَ زِجْعَلْا نَمِ كَبِ ذُوعُأَ ىِّنِإَمُهِّللَا»
نْمِوَ عُشْخَيِ لاَ بِلْقَنْمِوَ عُفْنَيِ لاَ مِلْعِنْمِ كَبِ ذُوعُأَ ىِّنِإَمُهِّللَا اهلاَوْمَوَ اهُّيِلوَ تَنْأَ اهَّكَزَ نْمَ رُيْخَ تَنْأَ اهِّكَ
ُمِلْسُمُ هاوَرَ .«اهَلَ بُابْجَتْسُيِ لاَ مٍوْعَدَ نْمِوَ عُبْشَتَ لاَ سٍفْنَ

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, বার্ধক্য ও কবরের ‘আযাব হতে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ! তুমি আমার আত্মাকে সংযমী করো ও একে পবিত্র করো। তুমিই শ্রেষ্ঠ পুতঃপবিত্রকারী, তুমি তার অভিভাবক ও রব। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ঐ জ্ঞান লাভ হতে আশ্রয় চাই, যে জ্ঞান (আত্মার) কোন উপকারে আসে না, ঐ অন্তর হতে মুক্তি চাই যে অন্তর তোমার ভয়ে ভীত হয় না। ঐ মন হতে আশ্রয় চাই যে মন তৃপ্তি লাভ করে না এবং ঐ দু‘আ হতে, যে দু‘আ কবূল করা হয় না। (মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস নং ২৪৬০)

আত্মা মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রুতে পরিণত হয় যখন সে তাকে পাপাচার ও সীমালংঘনের দিকে আহবান করে। কেননা এই অপরিশুদ্ধ, পাপাচারী, ব্যাধিগ্রস্ত অন্তর মানুষকে আল্লাহ্র স্মরণ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্তরের পরিশুদ্ধি ও এর অনিষ্ট থেকে পরিত্রাণ এর জন্য আল্লাহর কাছে বেশি দু'আ করতেন।

আত্মশুদ্ধির স্তর ও প্রক্রিয়া

কুরআন শুধু লক্ষ্যই নির্দেশ করে না, লক্ষ্যে পৌঁছানোর নির্দেশনাও দেয়। আত্মশুদ্ধি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, যার বিভিন্ন স্তর কুরআন ও হাদিসে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে:

আত্মসচেতনতা ও স্বীকৃতি (আল-ই'তিরাফ): আত্মশুদ্ধির প্রথম ধাপ হলো নিজের ভুলত্রুটি, দুর্বলতা ও পাপের ব্যাপারে সচেতন হওয়া এবং তা আল্লাহর কাছে স্পষ্টভাবে স্বীকার করা। কুরআনে হযরত আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.)-এর ঘটনায় এই সচেতনতার চিত্র ফুটে উঠেছে: "হে আমাদের রব! আমরা আমাদের নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি..." (সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ২৩)। এই আত্মস্বীকৃতি ছাড়া সংশোধন অসম্ভব।

তওবা ও ফিরে আসা (আত-তাওবাহ আন-নাসূহ): সচেতনতার পর আসে আন্তরিক অনুতাপ ও আল্লাহর দিকে ফিরে আসার অঙ্গীকার। কুরআন তওবাকে গভীরভাবে উৎসাহিত করে: "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে খাঁটি তওবা কর..." (সূরা আত-তাহরীম, আয়াত: ৮)। খাঁটি তওবা মানে পাপ থেকে বিরত থাকা, তার জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতে তা না করার দৃঢ় সংকল্প।

আল্লাহর জিকির ও কুরআন চর্চা (আয-যিকর ও তিলাওয়াতুল কুরআন): আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। আল্লাহ বলেন: "যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়। জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই অন্তর প্রশান্ত হয়।" (সূরা আর-রা'দ, আয়াত: ২৮)। নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত, তার অর্থ অনুধাবন (তাদাব্বুর) এবং মর্মার্থ নিয়ে চিন্তাভাবনা আত্মাকে আলোকিত করে, মলিনতা দূর করে।

নামাজ প্রতিষ্ঠা (ইকামাতুস সালাত): নামাজ শুধু শারীরিক ইবাদত নয়, এটি আত্মার জন্য এক শক্তিশালী পরিশোধন প্রক্রিয়া। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: "নিশ্চয়ই নামাজ অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে..." (সূরা আল-আনকাবুত, আয়াত: ৪৫)। খুশু-খুজুর সাথে নামাজ আদায় আত্মাকে কুপ্রবৃত্তির প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে সাহায্য করে।

রোজা পালন (সিয়াম): রোজা শুধু ক্ষুধা-তৃষ্ণার অনুভূতি নয়; এটি আত্মিক সংযম ও শক্তির উৎস। আল্লাহ রোজাকে সরাসরি আত্মশুদ্ধির সাথে যুক্ত করেছেন: "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৩)। রোজা নফসের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।

দান-সদকাহ (ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ): কৃপণতা ও লোভ আত্মাকে ভারাক্রান্ত করে। দান-সদকাহ সেই ভার লাঘব করে, আত্মাকে উদার ও পরোপকারী করে তোলে। কুরআনে বলা হয়েছে: "তোমরা যা কিছু দান করো তা তোমাদের নিজেদের কল্যাণের জন্যই। তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় যা ব্যয় করো, তার পুরস্কার তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে দেওয়া হবে..." (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৭২)।

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ (আল-আমর বিল মা'রুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার): নিজের সংশোধনের পাশাপাশি সমাজে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখাও আত্মশুদ্ধির অংশ। এটি আত্মাকে দায়িত্ববোধ ও সমাজসচেতনতায় উদ্ভাসিত করে।

আত্মশুদ্ধির ফলাফল

কুরআনের আলোকে আত্মশুদ্ধি-র সফল অনুশীলনই মানুষকে নিয়ে যায় সেই কাঙ্ক্ষিত রুহানী মুক্তি-র দোরগোড়ায়। এই মুক্তি কী?

আল্লাহর নৈকট্য লাভ: আত্মশুদ্ধির মূল লক্ষ্যই হল আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জন। পবিত্র আত্মাই আল্লাহর সান্নিধ্য পাওয়ার যোগ্য। কুরআনে বলা হয়েছে: "যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দন্ডায়মান হওয়ার ভয় করে এবং নিজের কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত থাকে, জান্নাতই হবে তার আবাসস্থল।" (সূরা আন-নাযি'আত, আয়াত: ৪০-৪১)।
অন্তরের গভীর শান্তি (ইত্মিন্নানুল ক্বালব): দুনিয়ার সব অস্থিরতা, দুঃশ্চিন্তা ও অশান্তির ঊর্ধ্বে এক অমূল্য প্রশান্তি। "যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়। জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই অন্তর প্রশান্ত হয়।" (সূরা আর-রা'দ, আয়াত: ২৮)।
কুপ্রবৃত্তি ও পাপের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি: নাফসের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে ইবাদত ও সৎকাজে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ লাভ করা।
দুনিয়াবী জীবনে ভারসাম্য ও সফলতা: আত্মশুদ্ধ মানুষ দুনিয়ার মোহে আটকে পড়ে না আবার দুনিয়াকে সম্পূর্ণ ত্যাগও করে না। সে আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতের সঠিক ব্যবহার জানেন (সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ৭৭)।

মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের সফলতা: চূড়ান্ত রুহানী মুক্তি তো মৃত্যুর পরই প্রকৃতভাবে পরিপূর্ণ হয়, যখন মুমিন বান্দা আল্লাহর রহমতে জান্নাতে প্রবেশ করে। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৮৫)।

নফসের বিভিন্ন অবস্থা

আত্মশুদ্ধি অর্জনের সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ আমাদের নিজের ভেতরেই বাস করে – 'নফস' বা প্রবৃত্তি যখন তা আল্লাহর অসন্তুষ্টির দিকে পরিচালিত হয়।
পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআ'লা মানুষের নফস বা অন্তরের তিন ধরনের প্রকৃতি এবং এর চ্যালেঞ্জ এর কথা উল্লেখ করেছেন-

১. নফসে আম্মারাহ বা কুমন্ত্রণাদানকারী আত্মা: যে আত্মা মানুষকে আল্লাহ ও তার রাসূলের অবাধ্যতা ও কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করার জন্য প্ররোচণা দেয়। যে তার অনুগত হয়ে খারাপ পথে পা বাড়ায় তাকে সে যাবতীয় অকল্যাণ ও হীনকর কাজে প্রলুব্ধ করে। এই স্তরে আত্মশুদ্ধির সংগ্রাম সবচেয়ে তীব্র।
এই নফস মন্দের প্রতি ধাবিত হয়:

ۚ يِّبَرَ َمحرَ اما لَّاِإ ءوُّسلِابٌ ةَرَّامَلَأ سَ ْفَّنلا َّنِإ

"....নিশ্চয় মানুষের মন মন্দ কর্মপ্রবণ কিন্তু সে নয়-আমার পালনকর্তা যার প্রতি অনুগ্রহ করেন। নিশ্চয় আমার পালনকর্তা ক্ষমাশীল, দয়ালু।" (সূরা ইউসূফ ১২:৫৩)

২. নফসে লাওয়ামাহ বা ভৎর্সনাকারী আত্মা: যে অন্তর মানুষকে তার কর্তব্যচ্যুতি ও বিপথগামীতার জন্য নিরন্তর ভৎর্সনা করে, ধিক্কার জানায় ও অনুতপ্ত হয়। এটা সংশোধনের ইতিবাচক ধাপ। এই নফস পাপ করার পর অনুশোচনায় ভোগে, নিজেকে ধিক্কার দেয়:

ِةَماَوَّللا سِ ْفَّنلاِبُ ِمسْقُأ لَاَو

"আর আমি শপথ করি সেই আত্মার, যে নিজেকে ধিক্কার দেয়।" (সূরা আল-কিয়ামাহ ৭৫:০২)

৩. নফসে মুত্বমাইন্নাহ বা প্রশান্ত আত্মা: যে অন্তর তাঁর রবের কাছে আত্ম-সমর্পণ করেছে এবং তাঁর আনুগত্যেই সুস্থির হয়েছে। যে আল্লাহ্ দাসত্বে-আনুগত্যে, তাঁর স্মরণে ও ভালবাসায় প্রশান্তি অর্জন করেছে। বর্তমান, ভবিষ্যৎ সবকিছুই তাঁর উপর সমর্পণ করেছে। তাঁর সাক্ষাৎ ও প্রতিশ্রুতির উপর পূর্ণ আস্থা রেখেছে এবং এক মুহূর্তের জন্যও যে অন্তর প্রভুর যিম্মাদারী থেকে বিচ্যুৎ হয় না। এটি আত্মশুদ্ধির চূড়ান্ত লক্ষ্য।

যে আত্মা আল্লাহর সান্নিধ্যে শান্তি পেয়েছে:

ۜيَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ★ ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً

“হে প্রশান্ত আত্মা! ফিরে আস তোমার রবের দিকে, সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে।” (সূরা আল-ফজর ৮৯:২৭-২৮)।

আত্মশুদ্ধি অর্জনে করণীয়

মানুষের অন্তরে দুই ধরনের গুণ বা চরিত্র আছে, প্রশংসনীয় বা ভালো গুণ এবং নিন্দনীয় গুণ বা মন্দ চরিত্র।

আত্মশুদ্ধির সারকথা হলো, প্রশংসনীয় গুণাবলী অর্জন ও বৃদ্ধি এবং নিন্দনীয় গুণ বর্জন। এই নিন্দনীয় বা মন্দ গুণগুলোই অন্তরকে রোগাক্রান্ত করে, আত্মার পরিশুদ্ধি ও পবিত্রতা অর্জনের পথে বাধার সৃষ্টি করে। তাই আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্য আত্মার এসব রোগব্যাধি বর্জন-দমন করা জরুরি।

সুতরাং, আমাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করার ক্ষেত্রে প্রথম কাজ হল- সব ধরনের রোগ-ব্যাধি থেকে তাকে মুক্ত করা।

কুরআন মাজীদে অন্তরের রোগ ও তার ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে উল্লেখিত একটি আয়াত সব সময় স্মরণ রাখার মতো। সেখানে নবীপত্মীদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ...

যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বনকারী হয়ে থাক, তবে (পর-পুরুষের সাথে) কোমল কণ্ঠে কথা বলো না। অন্যথায় যার অন্তরে রোগ আছে সে লালসায় পড়বে। —(সূরা আহযাব (৩৩) : ৩২)

এখানে নারী কণ্ঠের কোমলতায় লালসার শিকার হওয়া থেকে সতর্ক করতে গিয়ে বলা হয়েছে, তাতে এমন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যার অন্তরে রোগ আছে।

এখানে রুগ্ন অন্তরের কেবল একটি প্রকাশ তুলে ধরা হয়েছে। বাস্তবে এমন অন্তরের মানুষ নানাক্ষেত্রে নানান রকম গোনাহ ও পেরেশানীর শিকার হয়ে থাকে। জীবনের নানা ক্ষেত্রে তাদের কষ্ট ও দুর্ভোগ মনোজগতের অস্থিরতা কেবল বৃদ্ধিই করতে থাকে। ফলে জীবন ও জগৎ দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। পঙ্কিলতায় ছেয়ে যায় সকল ভাব ও ভাবনা।

অন্তরের এজাতীয় রোগ ও ব্যাধি কীভাবে বৃদ্ধি পায় সে বিষয়ে পরিষ্কারভাবে আলোচনা করা হয়েছে একটি হাদীসে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

‘বান্দা যখন কোনো গোনাহ করে তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। এরপর যখন সে গোনাহ থেকে নিবৃত্ত হয়, ক্ষমা চায় এবং তাওবা করে তখন তার অন্তর পরিষ্কার করে দেওয়া হয়। নতুবা পুনরায় গোনাহ করতে থাকলে সেই কালো দাগ আরও বাড়তে থাকে। একপর্যায়ে পুরো অন্তর (কালো দাগে) ছেয়ে যায়। সেটাকেই আল্লাহ তাআলা মরিচা বলে উল্লেখ করেছেন—

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰي قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ .

বরং তাদের কৃতকর্ম তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে। [সূরা মুতাফফিফীন (৮৩) : ১৪] — জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৩৩৪

মরিচার আস্তর জমে লৌহধাতু যেমন তার স্বাভাবিকতা, স্বচ্ছতা, সৌন্দর্য ও কার্যক্ষমতা হারাতে থাকে, মানব হৃদয়ও তেমনি হারাতে থাকে তার স্বভাব শক্তি। ফলে জীবনের বিশুদ্ধতা বিনষ্ট হতে থাকে, স্বাভাবিক-শুদ্ধ পথে চলা মন্থর হতে থাকে, হ্রাস পেতে থাকে পাপ প্রতিরোধের কুদরতী ক্ষমতা। আর তখনই মানুষ তার মানবমর্যাদা থেকে নিচে নামতে শুরু করে। সম্ভাবনার সকল দুয়ার থেকে দূরে সরতে থাকে। জীবন পর্যবসিত হয় গ্লানিমাখা ব্যর্থতায়।

রুগ্ন দেহের মতো রুগ্ন অন্তরও এক সময় তার স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তাতে পঁচন ধরে, দুর্গন্ধ ছড়ায়। পাশের মানুষজন সেই গন্ধ অনুভব করে। কষ্ট পায়।

দেহের বড় একটি রোগ যেমন ক্যান্সার, অন্তরেরও ক্যান্সারতুল্য রোগ হল অহংকার ও হিংসা। ক্যান্সারাক্রান্ত রোগীর যন্ত্রণা বর্ণনাতীত। দেহের ক্যান্সার দৃশ্যমান বলে তা মেশিনে ধরা পড়ে। অন্তরের ক্যান্সার অদৃশ্য বলে কোনো যন্ত্রে ধরা পড়ে না। তবে যন্ত্রণা অনভূত হয় দুটোরই এবং সকল কাজ-কর্মেই সে রোগের ছাপ থাকে।

এমনিভাবে অন্তরের অন্যান্য ব্যাধিগুলোর মধ্যে আছে লোভ, ক্ষোভ, কার্পণ্য, রিয়া বা লোকদেখানো মনোভাব, আত্মমুগ্ধতা, কুধারণা ও পরনিন্দা ইত্যাদি। এগুলো ছাড়াও ছোট-বড় আরো অনেক রোগ রয়েছে।

মনকে শিরক, কুফর, আত্মপ্রেম, কুরআন-সুন্নাহের বিপরীতে নিজের পছনদকে গুরুত্ব প্রদান, হিংসা, অহঙ্কার, লোভ, রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি থেকে হৃদয়কে মুক্ত ও পবিত্র করতে হবে। এগুলি বর্জনীয় মানসিক কর্ম। মনকে ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, আল্লাহ-ভীতি, আল্লাহর রহমতের আশা, আল্লাহর ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্টি, নির্লোভতা, সকলের প্রতি ভালবাসা, কল্যাণকামনা ইত্যাদি বিষয় দিয়ে পরিপূর্ণ করতে হবে। এগুলি করণীয় মানসিক কর্ম।

আমাদের উচিত অন্তরের রোগ-ব্যাধি সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং এর চিকিৎসা করা। হৃদয় ও অন্তরকে পবিত্র করা এবং সুস্থ, স্বাভাবিক ও প্রশান্তির জীবন যাপন করা।

মানসিক ও দৈহিক কর্ম

কুরআন-হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, কিছু মানসিক ও দৈহিক কর্ম আছে যা অতি সহজে আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য, সাওয়াব, রহমত ও বরকত লাভে সাহায্য করে। এ সকল কর্ম পালন করতে পারলে যাকির অতি অল্প আমলে অধিক সাওয়াব অর্জন করতে পারেন। আমাদের উচিত এগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা।

(১) জাগতিক জীবনের অস্থায়িত্ব স্মরণ

মানব জীবনে জাগতিক, সাংসারিক কর্মকান্ড, ব্যস্ততা ও চিন্তাভাবনা থাকবেই। আল্লাহ মানুষকে এসকল কর্মকান্ডে জড়িত থাকার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। তবে এই ব্যস্ততা ও কর্ম নিজের, পরিবারের ও সমাজের সকলের পৃথিবীতে সুন্দররূপে বাঁচার ও পারলৌকিক জীবনে মুক্তি ও আল্লাহর সানিধ্যে অফুরন্ত নিয়ামত লাভের জন্য। কর্মের মাধ্যমে আল্লাহর অফুরন্ত নিয়ামত ও বরকত অর্জন করে নিজে বাঁচতে হবে এবং অন্যকে বাঁচতে সাহায্য করতে হবে। কিন্তু শয়তানী প্ররোচনা ও মানবীয় দুর্বলতার কারণে আমরা সৃষ্টি ও কর্মের উদ্দেশ্যের একেবারে বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করি। আমরা স্বার্থপর হয়ে যাই এবং নিজের অপ্রয়োজনীয় ও অবৈধ স্বার্থরক্ষার জন্য অন্যান্যদের অকল্যাণ, ক্ষতি বা ধ্বংস কামনা করি বা সে জন্য চেষ্টা করি। এভাবে আমরা মূলত নিজেদেরকেও ধ্বংস করি। লোভ, লালসা, হিংসা, হানাহানি আমাদের হৃদয় ও জীবনকে বিষাক্ত ও কলুষিত করে, আমাদেরকে স্রষ্টার প্রেম, করুণা ও বরকত থেকে বঞ্চিত করে, তাঁর শাস্তির মধ্যে নিপতিত করে এবং সর্বোপরি আমাদের পারলৌকিক জীবনের কঠিন ধ্বংস ও ক্ষতি নিশ্চিত করে।

এই ক্ষতিকর পরিণতি থেকে আত্মরক্ষার জন্য যুগে যুগে অনেক মানুষ সন্যাস, বৈরাগ্য বা সমাজ বিচ্ছিন্ন জীবন বেছে নিয়েছেন। এভাবে সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যাহত করেছেন। ইসলামে বৈরাগ্য বা সমাজ বিচ্ছিন্ন জীবন নিষিদ্ধ। সমাজের মধ্যে বসবাস করে, সকল কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ করার সাথে সাথে নিজের হৃদয়কে মোহমুক্ত রাখায় ইসলামী বৈরাগ্য। আর এই অবস্থা অর্জনের অন্যতম

মাধ্যম প্রতিনিয়ত এই জাগতিক জীবনের অস্থায়িত্ব, মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী জীবনের কথা নিজে কে স্মরণ করানো। কুরআন ও হাদীসে এজন্য বারবার মৃত্যুর কথা স্মরণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই পৃথিবীতে নিজেকে প্রবাসী বা পথিক হিসাবে গণ্য করতে বলা হয়েছে। এই স্মরণ আমাদের জন্য অগণিত সাওয়াব অর্জনের পাশাপাশি আমাদের হৃদয়গুলিকে লোভ, হিংসা, প্রতি হিংসা ইত্যাদির কঠিন ভার থেকে মুক্ত করবে। আমাদের জীবনকে হানাহানি ও হিংস্রতা থেকে মু ক্ত করবে।

(২) সৃষ্টির কল্যাণে রত থাকা

আল্লাহর রহমত, বরকত ও সাওয়াব অর্জনের সবচেয়ে সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথ আল্লাহর সৃষ্টির প্র তি, বিশেষত মানুষের প্রতি কল্যাণ ও উপকারের হাত বাড়িয়ে দেওয়া। সকল জাগতিক প্রয়োজ নে সাহায্য করা, সমাজের কিছু মানুষের মধ্যে পরস্পরে গোলমাল বা অশান্তি হলে শান্তি প্রতিষ্ঠা র চেষ্টা করা, অসুস্থকে দেখতে যাওয়া, সেবা করা, বিপদে পড়লে উদ্ধার করা, মাযলূম হলে সাহা য্য করা, মৃত্যুবরণ করলে কাফন-
দাফনে শরীক হওয়া ইত্যাদি সকল প্রকার মানব সেবমূলক কাজের জন্য অকল্পনীয় সাওয়াব ও মর্যাদার কথা অগণিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যতক্ষণ একজন মানুষ অন্য কোনো মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত থাক বে ততক্ষণ আল্লাহ তার কল্যাণে রত থাকবেন। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় বান্দা যে মানুষের সবচেয়ে বেশি উপকার করে। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় নেক আমলকোনো মুসলিমের হৃদ য়ে আনন্দ প্রবেশ করান, অথবা তার বিপদ, কষ্ট বা উৎকণ্ঠা দূর করা, অথবা তার ঋণ আদায় ক রে দেওয়া, অথবা তার ক্ষুধা দূর করা। আমার কোনো ভাইয়ের কাজে তার সাথে একটু হেঁটে যা ওয়া আমার নিকট মসজিদে এক মাস ইতেকাফ করার চেয়েও বেশি প্রিয়। যে ব্যক্তি তার কোনো ভাইয়ের সাথে যেয়ে তার প্রয়োজন মিটিয়ে দেবে কিয়ামতের কঠিন দিনে যেদিন সকলের পা পি ছলে যাবে সেদিন আল্লাহ তার পা সুদৃঢ় রাখবেন। ... এইরূপ অগণিত হাদীস আমরা হাদীসের গ্র ন্থে দেখতে পাই। (মুনযিরী, আত-তারগীব ৩/৩৪৬-৩৫১, মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/১৯১, সহীহুল জামিয়িস সাগীর ১/৯৭।)

(৩) হিংসা-মুক্ত কল্যাণ কামনা

হৃদয়কে বিদ্বেষ, হিংসা ও অন্যের অমঙ্গল কামনা থেকে মুক্ত রাখা এমন একটি কর্ম যা মানুষকে অতিরিক্ত নফল ইবাদত ও যিকর আযকার ছাড়াই জান্নাতের অধিকারী করে তোলে। আনাস (রাঃ) বলেন, "একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে বসে ছিলাম, এমতাবস্থায় তিনি বললেন, এখন তোমাদের এখানে একজন জান্নাতী মানুষ প্রবেশ করবেন। ত

খন একজন আনসারী মানুষ প্রবেশ করলেন, যাঁর দাড়ি থেকে ওযুর পানি পড়ছিল এবং তাঁর বা ম হাতে তাঁর জুতাজুড়া ছিল। পরের দিনও রাসূলুল্লাহ (সা.) একই কথা বললেন এবং একই ব্য ক্তি প্রবেশ করলেন। তৃতীয় দিনেও রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রথম দিনের মতোই আবারো বললেন এবং আবারো একই ব্যক্তি প্রবেশ করলেন। তৃতীয় দিনে রাসূলুল্লাহ (সা.) মজলিস ভেঙ্গে চলে গেলে আব্দুল্লাহ ইবনু উমার উক্ত আনসারী ব্যক্তির পিছে পিছে যেয়ে বলেন, আমি আমার পিতার সাথে মন কষাকষি করেছি এবং তিন রাত বাড়িতে যাব না বলে কসম করেছি। সম্ভব হলে এই কয় রা ত আপনার কাছে থাকতে দিবেন কি? তিনি রাজি হন। (আব্দুল্লাহর ইচ্ছা হলো তিন রাত তাঁর কা ছে থেকে তাঁর ব্যক্তিগত ইবাদত জেনে সেই মতো আমল করা, যেন তিনিও জান্নাতী হতে পারেন)। তিনি তিন রাত তাঁর সাথে থাকেন, কিন্তু তাঁকে রাত্রে উঠে তাহাজ্জুদ আদায় করতে বা বিশেষ কোনো নফল ইবাদত পালন করতে দেখেন না। তবে তিন দিনের মধ্যে তাঁকে শুধুমাত্র ভালো ক থা ছাড়া কারো বিরুদ্ধে কোনো খারাপ কথা বলতে শোনেননি। আব্দুল্লাহ বলেন, আমার কাছে তাঁ র আমল খুবই নগণ্য মনে হতে লাগল। আমি বললামঃ দেখুন, আমার সাথে আমার পিতার কো নো মনমালিন্য হয়নি। তবে আমি পরপর তিনি দিন রাসূলুল্লাহ (সা.)-
কে বলতে শুনলাম এখন একজন জান্নাতী মানুষ আসবেন এবং তিনবারই আপনি আসলেন। এ জন্য আমি আপনার আমল দেখে সেইমতো আমল করার উদ্দেশ্যে আপনার কাছে তিন রাত্র কা টিয়েছি, কিন্তু আমি আপনাকে বিশেষ কোনো আমল করতে দেখলাম না! তাহলে কী কর্মের ফলে আপনাকে রাসূলুল্লাহ (সা.) জানণাতী বললেন? তিনি বললেন: তুমি যা দেখেছ এর বেশি কোনো আমল আমার নেই, তবে আমি আমার অন্তরের মধ্যে কোনো মুসলমানের জন্য কোনো অমঙ্গল ইচ্ছা রাখি না এবং আমি কোনো কিছুর জন্য কাউকে হিংসা করি না। তখন আব্দুল্লাহ বলেন, এই কর্মের জন্যই আপনি এই মর্যাদায় পৌঁছাতে পেরেছেন।" হাদিসটি সহীহ। (মুসনাদু আহমাদ, ৩ /১৬৬, নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৬/২১৫, মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/৭৮-৭৯।)

মানবীয় স্বভাবের কারণে আমাদের মনে বিশেষ মুহূর্তে ক্রোধ, কষ্ট বা বিরক্তি আসবেই। তবে ম নটা একটু শান্ত হলেই, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মনের মধ্য থেকে এই অনুভূতি দূর করার চেষ্টা কর তে হবে। আল্লাহর কাছে নিজের জন্য ও যার কর্মে বা ব্যবহারে আমরা কষ্ট পেয়েছি তার জন্য ই স্তিগফার করতে হবে ও দু'আ করতে হবে।প্রয়োজনে নিজের হক্ক রক্ষার জন্য চেষ্টা করতে হবে। তবে অধিকার আদায়ের চেষ্টা বা কর্ম আর মনের হিংসা ও শত্রুতা এক নয়। এক ব্যক্তি আমার অধিকার নষ্ট করেছেন, আমি তার নিকট থেকে আমার অধিকার আদায়ের চেষ্টা করছি। কিন্তু তা র সাথে আমার অন্য কোনো শত্রুতা নেই। আমি আমার অধিকার ফেরৎ পাওয়া ছাড়া তার কো নো প্রকার অমঙ্গল কামনা করি না। বরং আমি সর্বদা তার জন্য দু'আ করি। এভাবে হৃদয়কে অ

ভ্যস্ত করলে ইনশাআল্লাহ আমরা উপরিউক্ত সাহাবীর মতো হতে পারব এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাত জীবিত করার সাওয়াব অর্জন করতে পারব।

(৪) আত্মনিয়ন্ত্রণ ও ধৈর্যধারণ

মন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সহজেই অত্যন্ত বেশি সাওয়াব অর্জনের অন্যতম মাধ্যম সবর বা ধৈর্যধারণের গুণ অর্জন করা। ধৈর্য মুমিনের জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ধৈর্য বলতে নিষ্ক্রিয় নির্জীবতা বুঝানো হয় না, বরং সক্রিয় আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বুঝানো হয়। পারিপার্শিক অবস্থা বা অন্যের আচরণ দ্বারা নিজের আচরণ প্রভাবিত না করে নিজের স্থির সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নিজেকে পরিচালিত করার ক্ষমতা। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

أفضل الإيمان الصبر والسماحة

"ধৈর্য ও উদারতাই সর্বোত্তম ঈমান।" হাদীসটি সহীহ।[আলবানী, সিলসিলাতুস সহীহাহ ৩/৪৮২, নং ১৪৯৫।]

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ধৈর্য তিন প্রকারের: (১) বিপদ-আপদ ও কষ্টে ধৈর্য, (২) পাপ ও লোভ থেকে ধৈর্য এবং (৩) ক্রোধের মধ্যে ধৈর্য। বিপদে হতাশ বা অধৈর্য হয়ে পড়া একদিকে যেমন ঈমানের পরিপন্থী, অপরদিকে তা মানবীয় ব্যক্তিতেরব চরম পরাজয়। হতাশা, অস্থিরতা বা উৎকণ্ঠা বিপদ দূর করেনা, বিপদের কষ্ট কমায় না বা বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার পথ দেখায় না। সর্বোপরি হতাশা বা ধৈর্যহীনতা স্বয়ং একটি কঠিন বিপদ যা মানুষকে আরো অনেক কঠিন বিপদের মধ্যে নিপতিত করে। পক্ষান্তরে ধৈর্য বিপদ দূর না করলেও তা বিপদ নিয়ন্ত্রণ করে, বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য শান্তভাবে চিন্তা করার সুযোগ দেয় এবং অস্থিরতা জনিত অন্যান্য বিপদের পথরোধ করে। সর্বোপরি বিপদে কষ্টে ধৈর্যের মাধ্যমে মুমিন আল্লাহর নিকট মহান মর্যাদা, সাওয়াব, জাগতিক বরকত ও পারলৌকিক মুক্তি অর্জন করেন। কুরআন কারীমে এরশাদ করা হয়েছে: "আমি তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা এবং ধনসম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা অবশ্য পরীক্ষা করব। আর আপনি শুভ সংবাদ প্রদান করুন ধৈর্যশীলদেরকে, যারা তাদের উপর বিপদ আপতিত হলে বলে,
'আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তণকারী।"[সূরা বাকারাঃ ১৫৫-১৫৬।]

ধৈর্য হলো কর্মময় স্থিরচিত্ততা ও হতাশামুক্ত সুদৃঢ় মনোবল। মুমিন দৃঢ় মনোবল নিয়ে নিজের কল্যাণ ও স্বার্থ অর্জনের জন্য চেষ্টা করবেন। বিপদে আপদে কখনোই অতীতের ভুলভ্রান্তি নিয়ে হতাশা বা আফসোস করে সময় নষ্ট করবেন না বা মনের মধ্যে শয়তানের কুমন্ত্রণা ও হতাশার অ

নুপ্রবেশের দরজা খুলে দিবেন না। বরং যা ঘটার আল্লাহর ইচ্ছাতেই ঘটেছে এই বিশ্বাস নিয়ে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং দৃঢ় মনোবল নিয়ে কর্মের পথে এগোতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেছেনঃ

الْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِى كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِ اللَّهِ وَلاَ تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَىءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَنِّى فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا .وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ

“শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর নিকট দুর্বল মুমিনের চেয়ে অধিক প্রিয় ও অধিক কল্যাণময়, যদিও প্রত্যেকের ভিতরেই কল্যাণ রয়েছে।

তোমার জন্য যা কল্যাণকর তা অর্জনের জন্য তুমি সুদৃঢ় মনোবল নিয়ে সচেষ্ট হও এবং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর। কখনোই হতাশা বা অবসাদগ্রস্ত হবে না। যদি তুমি কোনো বিপদে-অসুবিধায় নিপতিত হও তবে তুমি বলবে না যে, যদি আমি এইরূপ করতাম!! বরং তুমি বলবে, আল্লাহর নির্ধারণ এবং তিনি যা ইচ্ছা করেছেন তাই করেছেন। কারণ ‘যদি করতাম!!’ বলে অতীতের কর্ম নিয়ে আফসোস শয়তানের কর্মের পথ উন্মুক্ত করে।”[মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২০৫২।]

ক্রোধের সময় ধৈর্য ধারণ করা ঈমানের অন্যতম দিক।রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ

“যে অপরকে মললযুদ্ধে পরাজিত করতে পারে সেই প্রকৃত বীর নয়, প্রকৃত বীর যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রিত রাখতে পারে।” [বুখারী, আস-সহীহ ৫/২২৬৭; মুসলিম আস-সহীহ ৪/২০১৪]

আবূ দারদা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলেন, আমাকে এমন একটি কর্ম শিখিয়ে দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। তিনি বলেনঃ

لا تغضب ولك الجنة

“তুমি ক্রোধান্বিত হবে না তাহলেই জান্নাত তোমার প্রাপ্য হবে।” [হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/৭০। হাদিসটির সনদ সহীহ।]

ক্রোধ সম্বরণ করা ও ক্রোধের সময় আত্ম নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) বিভিন্ন পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন, তন্মধ্যে রয়েছে, ক্রোধান্বিত হলে 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম' পাঠ করা, আল্লাহর ক্রোধের কথা স্মরণ করা, উত্তেজিত অবস্থায় কথা না বলে চুপ করে থাকা, মুখে-মাথায় ঠান্ডা পানি ব্যবহার করা, ওজু করা, দাঁড়িয়ে বা বসে থাকলে শয়ন করা ইত্যাদি।

ক্রোধের সময় আত্মনিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি যার কারণে ক্রোধের উদ্রেক হয়েছে বা যে কষ্ট দিয়েছে তাকে ক্ষমা করতে ও তার সাথে উত্তম আচরণ করতে বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কুরআন ও হাদীসে। বিশেষত যাকে শাস্তি দেওয়া সম্ভব সেইরূপ ব্যক্তিকে ক্ষমা করা অতীব প্রয়োজন। আল্লাহ বলেন,
"ভাল এবং মন্দ (আচরণ) সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। এই গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই যারা ধৈর্যশীল, এই গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই যারা মহা ভাগ্যবান।" [সূরা হা-মীম সাজদা (ফুসসিলাত) ৩৩–৩৫]

প্রকৃত মুমিনদের বৈশিষ্ট বর্ণনা করতে যেয়ে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন,
"তারা কবীরা গোনাহ সমূহ ও অশ্লীল কর্ম বর্জন করে এবং যখন তারা ক্রোধান্বিত হয় তখন তারা ক্ষমা করে।" [সূরা শূরাঃ ৩৭] অন্যত্র জান্নাতী মুমিনদের পরিচয়ে বলা হয়েছেঃ "তারা ক্রোধ সম্বরণ ও নিয়ন্ত্রণ করে এবং মানুষদেরকে ক্ষমা করে।" (সূরা আলে ইমরানঃ ১৩৪)

(৫) আল্লাহর প্রতি সু-ধারণা পোষণ

অন্তরের একটি সহজ ও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত আল্লাহর সু-ধারণা পোষণ করা ও সর্বদা আল্লাহর রহমতের আশায় হৃদয়কে ভরপুর রাখা। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেনঃ

)إن (حسن الظن) بالله (من حسن العبادة

"আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করা আল্লাহর সর্বোত্তম ইবাদতের অন্যতম।" [আবু দাউদ, আস-সুনান ৪/২৯৮, ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ২/৩৯৯; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/২৮৫, হাইসামী, মাওয়ারিদুয যামআন ৮/৩১।]

যত কঠিন বিপদ বা সমস্যাই আসুক না কেন, মুমিনের হৃদয়ে অবিচল আস্থা থাকে যে, তার করুণাময় দয়াময় প্রতিপালক তাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন এবং তার জন্য যা কল্যাণকর তারই ব্যবস্থা করবেন। আল্লাহর রহমতের প্রতি অবিচল আস্থার সামান্যতম ঘাটতি ঈমানেরই ঘাটতি। আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া, হতাশা বা অবসাদে আক্রান্ত হওয়া অবিশ্বাসেরই নামান্তর।

কুরআন কারীমে ইরশাদ করা হয়েছে:
“একমাত্র কাফির সম্প্রদায় ছাড়া কেউই আল্লাহর দয়া থেকে নিরাশ হয় না।” [সূরা ইউসুফঃ ৮৭।]
ভবিষ্যৎ নিয়ে হতাশা ও দুশ্চিন্তা শয়তানের বিদ্যালয়ের অন্যতম পাঠ্য। মহান করুণাময় আল্লাহ ইরশাদ করেছেন:
“শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় প্রদর্শন করে এবং তোমাদেরকে অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয়, আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও বরকত-রহমতের অঙ্গীকার করেন।”

আমরা একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারব যে, আমাদের অধিকাংশ দুশ্চিন্তাই ভবিষ্যতকে নিয়ে অমূলক দুশ্চিন্তা। রোগ ব্যধিতে আক্রান্ত হলে অধিকাংশ সময়েই আমরা খারাপ পরিণতির কথা চিন্তা করে হতাশা ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হই। ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা সমাজিক যে কোনো প্রকৃত বা সাম্ভাব্য সমস্যাকে নিয়ে আমাদের চিন্তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খারাপ দিকটা নিয়েই আবর্তিত হয়। অথচ সকল অবস্থায় ভাল চিন্তা করা, আল্লাহর রহমতে সকল বিপদ কেটে যাবেই এইরূপ সুদৃঢ় আশা পোষণ করা মুমিনের ঈমানের দাবী এবং আল্লাহর অন্যতম ইবাদত ও সাওয়াবের কাজ। যে বান্দা রহমতের আশা করতে পারেন না তিনি তো আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করতে পারলেন না। আর আল্লাহ তো বান্দার ধারণা ও আস্থা অনুসারেই তার প্রতি ব্যবহার করবেন।

সাম্ভাব্য বিপদের ক্ষেত্রে তো নয়ই, প্রকৃত বিপদের ক্ষেত্রেও মু’মিন কখনোই হতাশ হন না। কারণ মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন:
“নিশ্চয় কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে। নিশ্চয় কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে।” [সূরা ইনশিরাহঃ ৫-৬।]

এভাবে আল্লাহ একটি কষ্টের জন্য দুইটি স্বস্তির ওয়াদা করেছেন। এজন্য মুমিন কষ্ট, বিপদ বা অসুবিধার মধ্যে নিপতিত হলে এই ভেবে খুশি হন যে, এই কষ্ট মূলত আগত স্বস্তিরই পূর্বাভাস মাত্র। মহান আল্লাহ আমাদের অন্তরগুলি তাঁর রহমতের আশায় ভরে দিন এবং সকল হতাশা ও নৈরাশ্য থেকে মুক্ত রাখুন।

(৬) কৃতজ্ঞতা ও সন্তুষ্টি
শোকর অর্থ কৃতজ্ঞতা, রিদা অর্থ সন্তুষ্টি এবং কানা‘আত অর্থ স্বল্পে তুষ্টি। এই তিনটি কর্মে মুমিনের মনকে অনুশীলন করতে হবে। এগুলি দুনিয়া ও আখিরাতের অনন্ত নিয়ামতের উৎস। আল্লাহ বলেন:
“যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তবে আমি আরো বাড়িয়ে দেব। আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও তবে আমার শাস্তি বড় কঠিন।”[ ] সূরা ইবরাহীমঃ ৭।]

আমাদের প্রত্যেকের জীবনে অগণিত নেয়ামত রয়েছে। আবার অনেক কষ্টও রয়েছে। মানুষের একটি বড় দুর্বলতা আনন্দের কথা তাড়াতাড়ি ভুলে যাওয়া ও কষ্ট বেদনার কথা বারংবার স্মরণ করা। এই দুর্বলতা কাটাতে হবে। জীবনের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই ইতিবাচক হতে হ বে। আমরা কখনোই কষ্ট ও অসুবিধাগুলিকে বড় করে দেখব না। কষ্টের কথা বারংবার মনে ক রে জাবর কাটব না। বরং আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত, শান্তি, সুখ বারংবার স্মরণ করে আল্লাহর প্র তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব। এই ইতিবাচক ও কৃতজ্ঞতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করা মানব জীবনে র শ্রেষ্টতম সম্পদ। এই দৃষ্টিভঙ্গি যে কোনো মানুষের জীবনকে অনন্ত শান্তি ও পরিতৃপ্তিতে ভরে দেয়।

কষ্টের অনুভুতিকে ক্রমান্বয়ে কৃতজ্ঞতার অনুভুতিতে রূপান্তরিত করতে হবে। আল্লাহর অগনিত নিয়ামতের মধ্যে কিছু কষ্টের কারণে যদি গোনাহ ক্ষমা হয় ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায় তাহলে অসুবিধা কী? দুনিয়ায় প্রতিটি মানুষের জীবনেই বিপদাপদ ও অসুবিধা আসে। কাজেই আমার জীবনে তো কিছু অসুবিধা থাকবেই। বিপদ ও সমস্যা তো আরো কঠিন হতে পারত। অনেকের জীবনেই তো আমার চেয়েও অধিক কষ্ট আছে। কাজেই আমার হতাশ হওয়ার কিছু নেই। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق) والرزق (فلينظر إلى من هو أسفل منه ... فإنه أجد ر أن لايزدر نعمه الله عليه

“সম্পদে, শক্তিতে বা রিযকে তোমাদের চেয়ে উত্তম কারো দিকে যখন তোমাদের কারো দৃষ্টি প ড়বে, তখন যেন সে তার চেয়ে খারাপ অবস্থায় যারা আছে তাদের দিকেও দৃষ্টি করে। তাকে আ ল্লাহ যে নিয়ামতে দিয়েছেন তার প্রতি অবজ্ঞা ও অবমূল্যায়ন থেকে আত্মরক্ষার উপায় এটি।” [বু খারী, আস-সহীহ ৫/২৩৮০; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২২৭৫; তিরমিযী, আস-সুনান ৪/২৪৫।]

অতি সামান্য নেয়ামতেরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অভ্যাস তৈরি করতে হবে। সামান্যতম আনন্দ, তৃ প্তি, ভাললাগা, চারিপার্শের কারো সামান্যতম সুন্দর আচরণ সব কিছুর জন্য হৃদয়ভরে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। আমার প্রতিপালকের দেওয়া সামান্যতম নেয়মতও যে আমা র জন্য অনেক বড়। ছোট্ট নেয়ামতকে বড় করে অনুভব করলে আল্লাহ আরো বড় নেয়ামত প্রদা ন করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেনঃ

من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير

যে ব্যক্তি অল্পের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে বেশিরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। [আহমাদ, আল-মুসনাদ ৪/২৭৮, হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/২১৭। হাদিসটির সনদ গ্রহণযোগ্য।]

জীবনের সকল আনন্দ, সুখ, খুশি, লাভ, পুরস্কার ইত্যাদি সকল নিয়ামতের কথা প্রসঙ্গ ও সুযোগ পেলে অন্যদেরকে বলতে হবে। আমরা সাধারণত সুখের বা আনন্দের কথার চেয়ে দুঃখের কথা বলতে বেশি আগ্রহী। আমাদেরকে এর বিপরীত বলার অভ্যাস আয়ত্ব করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেনঃ

التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر

"আল্লাহর নিয়ামতের কথা বলা কৃতজ্ঞতা এবং তা না বলা অকৃতজ্ঞতা।" [আহমাদ, আল-মুসনাদ ৪/২৭৮, হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/২১৭। হাদিসটির সনদ গ্রহণযোগ্য।]

আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতার দাবি, বান্দার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। যদি কোনো ব্যক্তি আমাদের প্রতি সামান্যতম সহযোগিতা করেন তবে আমাদের দায়িত্ব, তার প্রতি পরিপূর্ণ আন্তরিকতার সাথে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। সম্ভব হলে তাকে প্রতিদান দেওয়া। না হলে তার জন্য দু'আ করা এবং তার উপকারের কথা অকপটে সকলের কাছে স্বীকার করা ও বলা। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

لا يشكر الله من لا يشكر الناس

"যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে আল্লাহর প্রতিও অকৃতজ্ঞ।" [তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৩৩৯। তিনি হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।]

অন্য হাদীসে তিনি বলেনঃ

من أتى إليكم معروفا فكافئوه ، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه

"যদি তোমাদের কাউকে কেউ কোনোভাবে উপকার করে তবে তোমরা তার প্রতিদান দেবে। যদি তোমরা প্রতিদান দিতে না পার তবে তার জন্য বেশি বেশি দোয়া করবে যাতে অনুভব করতে পার যে, তোমরা তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পেরেছ।" [আবু দাউদ, আস-সুনান ২/১২৮, ৩২৮; আলবানী, সহীহুত তারগীব ২/১০৩১। হাদিসটি সহীহ।]

(৭) নির্লোভতা

যুহদ অর্থ নির্লোভতা, নির্লিপ্ততা, বৈরাগ্য ইত্যাদি। ইসলামে সন্ন্যাস বা সংসারত্যাগের বৈরাগ্য নিষিদ্ধ। সাংসারিক ও সামাজিক জীবনের মধ্যে অবস্থান করে জাগতিক সম্পদ ও সম্মানের লোভ থেকে হৃদয়কে বিমুক্ত রাখতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। সচ্ছলতা, অসচ্ছলা, সম্মান ও অসম্মান সকল অবস্থায় হৃদয়ের অবস্থা এক থাকাই ইসলামী বৈরাগ্য। আল্লাহ যখন যেভাবে রাখবেন তখন সেই অবস্থায় বান্দা তার দায়িত্বগুলি পালন করতে সচেষ্ট থাকবেন। সম্পদ বা প্রতিপত্তি থাকলে তা দিয়ে বান্দা যথাসাধ্য আখিরাতের পাথেয় অর্জনের চেষ্টা করেন। সম্পদ বা প্রতিপত্তি না থাকলে বান্দা ভারমুক্ত হওয়ার কারণে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং নিরিবিলি আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহে ব্যস্ত থাকেন। যে কোনো সময়ে তার মালিকের ডাকে সাড়া দিয়ে নিজ আবাসে গমনের জন্য তিনি মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকেন।

এই জগতে মুমিন একজন পথচারী বা প্রবাসী মাত্র। বাস, রেল বা বিমানে ভাল সিট পেতে চান যাত্রী, কিন্তু ভাল সিট না পেলে দুশ্চিন্তায় মনকে ভারাক্রান্ত করেন না। যে সিট পেয়েছেন তাতে বসেই নিজের গন্তব্যস্থলে গমন করেন। পথের সৌন্দর্য ও শান্তি তাকে আনন্দিত করে। কিন্তু পথের কষ্ট তাকে হতাশ করে না।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) একটি চাটাইয়ের উপর ঘুমিয়ে ছিলেন। তিনি ঘুম থেকে উঠলে আমরা দেখলাম যে, তার দেহে চাইয়ের দাগ হয়ে গিয়েছে। আমরা বললামঃ, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি অনুমতি দিলে আমরা আপনার জন্য একটি বিছানা বানিয়ে দিতে চাই। তিনি বলেন,

ما لي وما للدنيا؟ ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها

“আমার সাথে দুনিয়ার কী সম্পর্ক! দুনিয়াতে আমার অবস্থা অবিকল সেই আরোহীর মত, যে একটি গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিয়েছে এবং এরপর গাছটি ফেলে রেখে সে চলে গিয়েছে।”[তিরমিযী, ৪/৫৮৮। তিনি হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।]

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ

“তুমি দুনিয়াতে এমন হও, যেন তুমি প্রবাসী অথবা পথচারী। ইবনু উমার বলতেন, যখন সন্ধ্যা হবে, তখন তুমি পরবর্তী সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকবে এই অপেক্ষা করবে না। আর যখন সকাল হবে তখন তুমি পরবর্তী সন্ধ্যার অপেক্ষায় থাকবে না। তোমার সুস্থতা থেকে তুমি তোমার অসুস্থতা

র পাথেয় সংগ্রহ কর এবং তোমার জীবন থেকে তুমি তোমার মৃত্যুর জন্য পাথেয় গ্রহণ কর।" [বুখারী, আস-সহীহ ৫/২৩৫৮।]

সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

ازهد في الدنيا يحبّك الله ، وازهد فيما عند الناس يحبّك الناس

"দুনিয়ার বিষয়ে নির্লিপ্ত-নির্লোভ হও, তাহলে আল্লাহ তোমাকে ভালবাসবেন, আর মানুষের হাতে যা আছে তা থেকে নির্লিপ্ত- নির্লোভ হও, তাহলে মানুষ তোমাকে ভালবাসবে।" হাদীসটি সহীহ। [ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ২/১৩৭৩; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/৩৪৮; আলবানী, সহীহুল জামে' ১/২২০]

(৮) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা.) প্রেম

আল্লাহর প্রিয় হার্দিক কর্মের অন্যতম ভালবাসা। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-
কে অন্য সকল কিছু এবং নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালবাসতে হবে। এবং আল্লাহর ওয়াস্তে সকল মুমিনকে ভালবাসতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

ثلاثٌ من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما

"তিনটি বিষয় যার মধ্যে থাকবে সে ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে পারবে, প্রথম বিষয় যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল অন্য সকলের চেয়ে তার নিকট বেশি প্রিয় হবেন।"[বুখারী, আস-সহীহ ১/১৪, ১৬, ৬/২৫৪৬; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৬৬]

তিনি আরো বলেছেনঃ

لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

"তোমাদের কেউ ততক্ষন মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষন না সে আমাকে তার পিতা, সন্তান ও সকল মানৃষের চেয়ে বেশী ভালবাসবে।" [বুখারী, আস-সহীহ ১/১৪, ৬/২৪৪৫; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৬৭।]

ভালবাসা অর্জনের অন্যতম উপায় সাহচার্য ও অনুকরণ। সাহাবীগণ এভাবেই সত্যিকারের নবী প্রেম অর্জন করতে পেরেছিলেন। পরবর্তী কালের নবীপ্রেমিকগণ দৈহিক সাহচার্য না পেলেও সার্বক্ষণিকভাবে তাঁর রেখে যাওয়া কুরআন ও হাদীস পাঠ, তাঁর ও তাঁর সহচরদের জীবনী পাঠ ও আলোচনার মাধ্যমে তাঁর রুহানী সাহচার্য লাভ করে তাঁর ভালবাসা অর্জন করেছিলেন। জীবনের

প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁরই হুবহু অনুকরণ ও অনুসরণ করে হৃদয়ের মধ্যে এই ভালবাসাকে চিরস্থায়ী ও পরিপূর্ণ করেছিলেন তাঁরা। আমাদেরও এপথে এগোতে হবে।

নবীর (সা.) সকল উম্মাতকে ভালবাসা নবী-
প্রেমের অংশ। যার মধ্যে তাঁর আনুগত্য, অনুসরণ ও অনুকরণ যত বেশি তার প্রতি মুমিনের প্রে মও তত বেশি। আল্লাহর ওয়াস্তে এই ভালবাসা। দল, মত, পাওনা, দেনা ইত্যাদি কারণে তা বা ড়ে না বা কমে না। বরং দীন পালনের কারণে তা বাড়ে-কমে।

(৯) সুন্দর আচরণ

সমাজের সকলের সাথে উত্তম ও শোভনীয় আচরণ করা আল্লাহর প্রিয়তম ইবাদতসমূহের অন্য তম। আবূ দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

مَا مِنْ شَيْءٍ يُوضَعُ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ

“কিয়ামতের দিন কর্মবিচারের পাল্লায় বান্দার সবচেয়ে ভারী ও মূল্যবান কর্ম হবে সুনদর আচরণ এবং সুনদর আচরণের অধিকারী মানুষ শুধু তার সুন্দর ব্যবহারের বিনিময়েই নফল সালাত ও নফল সিয়াম পালন করার সাওয়াব অর্জন করবে। [তিরমিযী, আস-
সুনান ৪/৩৬৩; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/২২; আলবানী, সহীহুল জামে’ ২/৯৯৮।]

মুমিনের আচরণ এমনই যে সহজেই তিনি মানুষকে আপন করে নেন এবং অন্যেরাও তাকে আপ ন করে ভালবেসে ফেলে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেনঃ

الْمُؤْمِنُ يَأْلَفُ وَيُؤْلَفُ ، وَلا خَيْرَ فِيمَنْ لا يَأْلَفُ وَلا يُؤْلَفُ

“মুমিন ঐ ব্যক্তি যে নিজে অন্যদেরকে ভালবাসে এবং অন্যেরাও তাকে ভালবাসে। যে ব্যক্তি নি জে অন্যদের ভালবাসে না এবং অন্যরাও তাকে ভালবাসে না তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।” হাদীসটি হাসান।[আলবানী, সহীহুল জামে’ ২/৯৯৮।]

হাদীসের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, হুসনে খুলুক বা সুন্দর আচরণের তিনটি দিক রয়ে ছে। প্রথমত: কথা ও আচরণের

ক্ষেত্রে বিনম্রতা, প্রফুল্ল চিত্ত, হাস্যোজ্জ্বল মুখ, সত্য পরায়ণতা, কম কথা বলা ও বেশি শ্রবণ করা। দ্বিতীয়ত, কোনো কারণে ক্রোধান্বিত হলে গালি গালাজ, অভিশাপ ও সীমালঙ্ঘণ বর্জন করা। তৃ

তীয়ত, ক্ষমা করা, বিশেষত প্রতিশোধ নেওয়া বা প্রতিউত্তর দেওয়ার ক্ষমতা থাকলে ক্ষমা করে দেওয়া। এইরূপ আচরণের অধিকারী কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সবচেয়ে নৈকট্যের মর্যাদায় সমাসীন হবেন। আর এর বিপরীত আচরণের অধিকারী সবচেয়ে দূরবর্তী অবস্থানে থাক বেন। জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا ، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ ، وَالْمُتَشَدِّقُونَ ، وَالْمُتَفَيْهِقُونَ

“তোমাদের মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় ও কেয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে আমার সবচেয়ে নি কটবর্তী অবস্থান লাভ করবে যাদের আচরণ সবচেয়ে সুন্দর। আর তোমাদের মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে বেশি অপ্রিয় এবং কেয়ামতের দিন আমার থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থান করবে তারা যারা বেশি কথা বলে, যাদের কথায় বা আচরণে অহংকার প্রকাশিত হয় এবং যারা কথাবার্তায় অ ন্যের প্রতি অবজ্ঞা বা অভদ্রতা প্রকাশ করে।” হাদীসটি হাসান। [তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৩৭০।]

(১০) নফল সিয়াম ও নফল দান

আমরা দেখেছি যে, সকল ইবাদতই মূলত যিকর। আল্লাহর পথে আগ্রসর হওয়ার জন্য ফরয ই বাদত পালনের পরে বেশি বেশি নফল ইবাদত মুমিনের পাথেয়। বিশেষত নফল সিয়াম, নফল দান, নফল ইলম অর্জন ইত্যাদি ইবাদত বেশি বেশি পালনের চেষ্টা করতে হবে। নফল সিয়াম বা সিয়াম মুমিনের জীবনে অন্যতম ইবাদত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণ নফল সিয়াম পাল নের বিষয়ে খুবই গুরুত্ব আরোপ করতেন। তাঁরা নিয়মিত ও অনিয়মিত নফল সিয়াম পালন কর তেন। প্রতি দুইদিন পর একদিন, বা একদিন পর একদিন, বা প্রতি সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্প তিবার, প্রতি আরবী মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ, প্রতি মাসের প্রথমে ও শেষে নিয়মিত নফল সিয়াম পালনের বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেছেন রাসূলুল্লাহ (সা.)। এছাড়া সুযোগমতো যত বেশি সম্ভব অনিয়মিত নফল সিয়াম পালন করতেন তিনি।

নফল দান, সাদকা, সাহায্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। প্রত্যেক মুমিনের নিয়মিত ও অনিয়মিত দানের অভ্যাস রাখা প্রয়োজন। মানুষের অভাব চিরন্তন। মনের অভাব থেকে কেউই মুক্ত নয়। মু মিন সর্বদা চেষ্টা করবেন অতি প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যা মেটানোর পর প্রতিদি ন, প্রতি সপ্তাহে, প্রতি মাসে নিয়মিত কিছু নির্ধারিত এতিম, বিধবা, অসহায় বা অভাবী মানুষকে সাহায্য করার। এছাড়া সর্বদা সাধ্যমতো দান করার চেষ্টা করতে হবে। দানের প্রয়োজনীয়তা, গু রুত্ব ও সাওয়াব বিষয়ে হাদীস আলোচনা করার জন্য পৃথক বই প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ (সা.) মদি নার অধিপতি ছিলেন। আল্লাহর নির্ধারিত বিধান অনুসারে তিনি যুদ্ধলব্ধ গনীমত থেকে এক পঞ্চ

মাংশ পেতেন। পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তা অভাবী মানুষদের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সন্ধ্যার আগেই তাঁর সব সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যেত। মাসের পর মাস তাঁর স্ত্রীগণের ঘরে রান্না করার মতো কিছুই থাকত না। শুধুমাত্র ২/১ টি শুকনো খেজুর ও পানি খেয়েই তাঁদের মাসের পর মাস চলে যেত। এ সকল ঘটনা বিস্তারিত বলতে গেলে বিশাল আকারের বই লিখতে হবে।

সাহাবায়ে কেরাম সর্বদা এ ধরনের ব্যয়ের জন্য আগ্রহী ছিলেন। তাঁদের জীবনে এ ধরনের অগণিত ঘটনা রয়েছে, যা আলোচনা করলে আমাদের পার্থিব সম্পদ ও বিলাসিতার লোভ কিছুটা কমতে পারে। এই পুস্তকের ক্ষুদ্র পরিসরে শুধু দু'টি ঘটনা উল্লেখ করছি। উমার (রাঃ) জাবির (রাঃ)-এর হাতে একটি দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) দেখতে পান। তিনি জিজ্ঞাসা করেন: দিরহাম দিয়ে কী করবে? জাবির বলেন: আমার পরিবারের সদস্যগণ খুবই শখ করেছে মাংস খাওয়ার, তাই তাদের জন্য কিছু মাংস ক্রয় করব। উমার অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বারবার বলতে থাকেন -
'শখ করেছে?' জাবির বলেন: আমি মনে মনে কামনা করছিলাম, আমার হাতের দিরহামটি যদি হারিয়ে যেত এবং উমার তা না দেখতেন ! উমার (রাঃ) বলেনঃ

أكُلَّ ما اشْتهيتُمْ اشْتَريتُمْ !ما يُريدُ أحدُكمْ أنْ يَطْوِيَ بَطنَهُ لابْنِ عمِّهِ وجارِهِ ؟ أين تَذهبُ عنكُمْ هذه الآيةُ - أَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ في حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا واسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا

"তোমাদের যা শখ হবে তাই কিনবে? তোমাদের মধ্যে কেউ কি চায় না যে, তার ভাইয়ের জন্য ও প্রতিবেশীর জন্য একটু ক্ষুধার্ত থাকবে (নিজে ক্ষুধার্ত থেকে সেই অর্থ তার ভাইকে প্রদান করবে)? আল্লাহ বলেছেনঃ যেদিন কাফিরদেরকে জাহান্নামের কাছে উপস্থিত করা হবে, সেদিন বলা হবেঃ তোমরা তোমাদের সুখ ও মজাদার সব কিছু তো পার্থিব জীবনেই ভোগ করে শেষ করে ফেলেছ, সুতরাং আজ তোমাদরেকে অপমানকর আযাবের শাস্তি প্রদান করা হবে।"[সূরা আহকাফঃ ২০।] তোমরা কি কুরআনের এই বাণী ভুলে গেলে? [ইমাম মালিক, আল-মুয়াত্তা (কাইরো, দারু এহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, ১৯৫১) ২/৯৩৬, হাকিম, আল-মুসতাদরাক ২/৪৯৪।]

অন্য এক ঘটনায় আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) বলেন, একদিন তিনি খাবারের মাজলিসে বসে খাচ্ছিলেন, এমতাবস্থায় তাঁর পিতা উমার (রাঃ) তার ঘরে প্রবেশ করেন। তিনি সরে গিয়ে তাঁর জন্য মাজলিসের সামনে স্থান করে দেন। উমার (রাঃ) বসে বিসমিল্লাহ বলে এক লোকমা গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় লোকমা মুখে দেওয়ার পরে তিনি বলেন, আমি খাদ্যের মধ্যে চর্বির গন্ধ পাচ্ছি, যা মাংসের চর্বি বলে মনে হচ্ছে না। তখন আব্দুল্লাহ বলেন, আমি বাজারে গিয়েছিলাম মোটাতাজা

ছাগলের মাংস কেনার আশায়। কিন্তু বাজারে গিয়ে দেখলাম তার মূল্য বেশি। এজন্য এক দিরহাম দিয়ে রোগাপটকা বকরির মাংস কিনলাম এবং এক দিরহাম দিয়ে ঘি কিনে এর সাথে মিশালাম, যেন ছেলেমেয়েরা ভালোভাবে মাংসটুকু চেটেপুটে খেতে পারে। তখন উমার (রাঃ) বলেনঃ

ما اجتمعا عند رسول الله صلّى الله عليه وسلم قط إلا أكل أحدهما وتصدق بالاخر

"যখনই রাসূলুল্লাহ (সা.)-
এর কাছে দুটি দিরহাম জমা হতো, তখনই তিনি তার একটি দিরহাম দিয়ে খাদ্য ক্রয় করতেন এবং অন্যটি তিনি দান করতেন।" এ কথা শুনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন,
"হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি খানা গ্রহণ করুন। ভবিষ্যতে কখনোই আমি এর ব্যতিক্রম করব না। যদি কখনো আমি দু'টি দিরহামের মালিক হয় তাহলে ঠিক রাসূলুল্লাহ (সা.) যেভাবে ব্যয় করেছেন (একটি সংসারের জন্য ও অপরটি সমাজের জন্য) সেভাবেই আমি ব্যয় করব।"[ইবনু মাজাহ, সুনান ২/১১১৫, কিতাবুল আত'ইমাহ, নং ৩৩৬১।]
এ ছিল সুন্নাতে রাসূল ও সুন্নাতে সাহাবা। আর কোথায় আমরা !

আত্মশুদ্ধি অর্জনের উপায়

কুরআন-হাদীসে আত্মা পরিশুদ্ধ করার বিভিন্ন উপায় ও পদ্ধতি বিদ্যমান। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি তুলে ধরা হলো-
ঈমানের পরিশুদ্ধি : আত্মশুদ্ধির চাবি হল ঈমানকে পরিশুদ্ধ করা। তাওহিদ ও রিসালত তথা সপ্ত বিষয়ে পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা।। নতুবা আত্মশুদ্ধির সমস্ত প্রচেষ্টাই পন্ডশ্রম। ইরশাদ হচ্ছে : যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা, তাঁর ফেরেশতাগণ, কিতাবাদি,রাসূলগণ ও পরকালের প্রতি অবিশ্বাস করে, সে পথভ্রষ্টতায় অনেক দূরে সরে পড়েছে।

হালাল-হারাম সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান অর্জন করা: জীবনের সর্বক্ষেত্রে হালাল-হারাম বাছাই করে চলার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে। আত্মাকে সর্বতোভাবে পরিশুদ্ধ রাখার জন্য যা অত্যাবশ্যক। যাবতীয় বদ গুণাবলী থেকে নিজেকে পরহেয করে রাখতে হবে। নিয়মিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলে এক সময় তা অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে মানুষের স্বভাবগত হয়ে পড়ে। আল্লাহ পাক বলেন, 'যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎ কর্মশীলদের সাথে আছেন'
(আনকাবূত ৬৯)।

ফরয ইবাদত সমূহ নিয়মিত আদায় করা : কেননা ফরয ইবাদত আল্লাহর আনুগত্যের সর্বোত্তম বহিঃপ্রকাশ যার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর সর্বাধিক নিকটবর্তী হয়। রাসূল (ছাঃ) হাদীছে কুদসীতে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ বলেন,'বান্দা আমার নিকটতর হ'তে পারে না এমন কোন আমল দ্বারা যা আমার নিকট অধিক প্রিয়তর হ'তে পারে আমি যেটা ফরয করেছি তা (ছালাত)অপেক্ষা' (বুখারী, মিশকাত হা/২২৬৬)।

অধিক মাত্রায় নফল ইবাদত করা : কেননা নফল ইবাদতকারী ব্যক্তিকেও আল্লাহ পাক তার নৈকট্যের সুসংবাদ দিয়েছেন (ঐ)। নফল আমলের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি অধিক বিনয়াবনতভাব প্রকাশ পায়, যা আত্মার পরিশুদ্ধিতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে।

পবিত্র কুরআন পাঠ করা ও তাতে চিন্তা-গবেষণা নিয়োজিত করা :কুরআন পাঠ অন্তরের কালিমা দূর করে দেয়। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বার বার এই কুরআনকে গবেষণা করার জন্য আহবান জানিয়েছেন। আত্মার প্রশান্তিতে কুরআন তেলাওয়াতের ভূমিকা যে কত অপরিসীম পবিত্র কুরআনে ও বহু হাদীছে তা বর্ণিত হয়েছে।

তওবা : আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশের প্রথম পদক্ষেপ হল তওবা করা। তওবার মাধ্যমেই মানুষ পাপ বর্জন করে পুণ্য অর্জনের তৃপ্তি অনুভব করতে পারে। আল্লাহ বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ তোমরা সকলে আল্লাহর সমীপে তওবা করো যেন তোমরা কৃতকার্য হ'তে পার' (নূর ৩১)।

তিনি আরো বলেন, 'হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট প্রকৃতভাবে তওবা করো; আশা করা যায় আল্লাহ তোমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা করে দেবেন' (তাহরীম ৮)।

আল্লাহর স্মরণ করা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা: আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্য এক শয়তানকে নিয়োজিত করে দেই, অতঃপর সে-ই হয় তার সঙ্গী' (যুখরুফ ৩৬)।

আল্লাহ্ বলেন, 'তারা (মু'মিনরা) কখনো পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়লে অথবা অন্যায় কাজ করে নিজের আত্মার উপরে যুলুম করে ফেললে আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে' (আলে ইমরান ১৩৫)।

'(মুমিনরা) রাত্রের শেষ প্রহরে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে' (আলে ইমরান ১৭)।

'কেউ যদি পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে কিংবা নিজের উপর যুলুম করে ফেলে অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় সে আল্লাহ্কে ক্ষমাশীল ও দয়াময় হিসাবেই পাবে' (নিসা ১১০)।

আল্লাহর আনুগত্যে থাকার জন্য নিজেকে তিরস্কার করা :অন্যায় কাজের জন্য অন্তরকে ভৎর্সনা ও তিরস্কার করলে নাফসে আম্মারাহ (কুপ্রবৃত্তি) নাফসে মুতমায়িন্নায় (প্রশান্ত আত্মা) পরিণত হয়। অন্যকে উপদেশ দানের পূর্বে নিজেকে বারবার উপদেশ দিতে হবে। সবসময় মৃত্যু ও পরকালের কথা চিন্তা করতে হবে। নিজেকে এমন ভাবে প্রস্তুত করতে হবে যেন অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে, ব্যস্ততার পূর্বে অবসরকে, দারিদ্রের পূর্বে প্রাচুর্যকে, বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে, মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে পুরোপুরিভাবে পরকালীন প্রস্তুতিতে কাজে লাগানো যায়।

আমলকে রিয়া (লোক প্রদর্শনী) থেকে বিরত রাখা :লোক দেখানোর জন্য অথবা অন্যের নিকট প্রশংসা পাওয়া, দোষারোপ থেকে রেহাই পাওয়া, সম্মান-প্রতিপত্তি অর্জন, ক্ষমতা লাভ করা ইত্যাদি অসৎ উদ্দেশ্যে কৃত আমল আল্লাহর নিকট গ্রহণ যোগ্য নয়। এ সমস্ত কাজ মানুষকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিখাদ চিত্ত হওয়া (ইখলাছ) থেকে চরমভাবে বাধাগ্রস্ত করে। ফলে তার নেকআমল আর অন্তর থেকে পালিত হয় না। তার অন্তর হয়ে পড়ে মৃত। তা আর আলোকিত হ'তে পারে না, পারে না সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য চিহ্নিত করতে। হারিয়ে ফেলে আল্লাহর বন্ধু ও আল্লাহর শত্রুদের মাঝে ব্যবধান করার যোগ্যতাটুকুও (ঐ ১/১৭৫)।

আত্মসমালোচনা :

আল্লাহ রাববুল আলামীন পবিত্র কুরআনে মানব সম্প্রদায়কে নির্দেশ দিয়েছেন,

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য উচিৎ, আগামী কালের জন্য সে কি প্রেরণ করেছে তা চিন্তা করা' (হাশর ১৮)।

ওমর (রাঃ) এক খুৎবায় বলেন, হে মানুষ! তোমরা নিজেদের হিসাব নিজেরাই গ্রহণ কর, চূড়ান্ত দিবসে হিসাব গৃহীত হওয়ার পূর্বেই। তোমাদের অন্তরাত্মাকে তোমরা পরিমাপ কর চূড়ান্ত দিনের পরিমাপের পূর্বেই। কেননা আজকের দিনে নিজেকে পরিমাপ করা আগামী দিনের তুলনায় বহুগুণে সহজ। সেদিনের মঞ্চে উপস্থিত হওয়ার জন্য নিজেকে অলংকৃত করে সৌন্দর্য্য মন্ডিত করে নাও, যেদিন কোন গোপন কারীর গোপনীয়তা আর অপ্রকাশ্য থাকবে না।

মায়মূন বিন মিহরান বলেন, কোন ব্যক্তি মুত্তাকী হ'তে পারে না যতক্ষণ না সে নিজের হিসাব গ্রহণ করে, যেমন সে অন্যের কাছে হিসাব নেয় যে, সে কোথা থেকে খাদ্য ও পোষাক সংগ্রহ করেছে। ইবনুল কাইয়্যিম বলেন, এমন অনেকে রয়েছে যে নেক আমল প্রচুর করে কিন্তু নিজের খারাপ গুণসমূহ দূর করার অবসর পায় না। ফলে অচিরেই তার মাঝে রিয়া, আত্মগর্ব ইত্যাদি বদগুণ পাহাড়ের মত স্থায়ী জায়গা করে নেয়, যাকে সে কিছুই মনে

করে না। এজন্য আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি সে-ই যে সৎ আমল অধিক করে এবং সতর্কতার সাথে অসৎ গুণ থেকে দূরে থাকে।
আল্লাহ বলেন, 'তারা (মু'মিনরা) রাতের কম অংশেই নিদ্রা যেত এবং শেষ রাতে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত' (যারিয়াত ১৮)।

কম ঘুমানো, কম খাওয়া ও কম কথা বলা : আল্লাহর স্মরণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অতিমাত্রায় কথা বলা অন্তরকে আবশ্যকীয়ভাবে কঠিন করে তোলে। আর কঠিন অন্তরের মানুষের অবস্থান আল্লাহ থেকে সবচেয়ে দূরে। অধিক মাত্রায় খানা-পিনা শয়তানী প্রবৃত্তিকে উস্কে দেয় এবং ঘুম বৃদ্ধি করে দেয়। আর অধিক ঘুম জীবনের গুরুত্ব পূর্ণ সময় নষ্ট করার সাথে সাথে আলস্য ও কর্ম ক্ষমতা হ্রাসেরও কারণ। এজন্য রাসূল (ছাঃ) সকল কাজে মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন।

দো'আ করা : সর্বোপরি আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য আল্লাহ পাকের নিকট আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করা অপরিহার্য। কেননা আল্লাহর অনুগ্রহই কেবলমাত্র মানুষের সৎপথ প্রাপ্তি ও আত্মশুদ্ধি নিশ্চিত করতে পারে (নূর ২১)।
দো'আ মু'মিনের অস্ত্রস্বরূপ। দো'আর মাধ্যমেই সে আল্লাহর কাছে অকল্যাণ থেকে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং আল্লাহর আনুগত্যের জন্য সাহায্য প্রাপ্ত হয়। রাসূল (ছাঃ) এজন্য দো'আ করতেন (আমাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য), 'হে প্রভু! তুমি আমাকে সর্বোত্তম চরিত্র ও সর্বোত্তম আমলের দিকে পথ-প্রদর্শন কর। কেননা উৎকৃষ্টতার দিকে পথপ্রদর্শন করার সাধ্য তুমি ছাড়া আর কারো নেই। তুমি আমাকে অসৎ চরিত্র ও অসৎ আমল হ'তে পরিত্রাণ দাও। কেননা তুমি ব্যতীত কেউই বদস্বভাব থেকে উদ্ধার করতে পারে না' (নাসাঈ, মিশকাত হা/৮২০)।
'হে প্রভু! আমাকে পরিশুদ্ধ করে দাও, আমাকে সংশোধন করে দাও এবং সৎকর্ম ও সৎচরিত্রের দিকে আমাকে পথ দেখিয়ে দাও। কেননা সুপথ প্রদর্শন করা ও কুপথ থেকে ফিরিয়ে আনার সাধ্য তুমি ব্যতীত কারো নেই' (আল জামে'উছ ছাগীর হা/২১৪৬)।

নেককারদের সুহবত: তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধির জন্য আল্লাহ ওয়ালাদের সুহবত অসাধারণ ক্রিয়া করে থাকে। আকীদা ও জাহেরী আমল দুরস্ত হয়। অন্তরে এক নতুন অবস্থা অনুভূত হয়, যা ইতিপূর্বে ছিলো না। যে অবস্থার প্রতিক্রিয়া এই যে, প্রতিনিয়ত ইবাদতের প্রতি আগ্রহ, গুনাহের প্রতি ঘৃণা ও আকীদা-বিশ্বাসের দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায়।
তাই আল্লাহ ওয়ালাদের সুহবত গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ অর্থাৎ

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো। [সূরা তাওবা,আয়াত:১১৯] আত্মশুদ্ধি কেবল কিতাব মুতালাআ ও জ্ঞানের বিশাল ভান্ডার সঞ্চয় করার দ্বারা অর্জিত হয় না। বরং এর জন্য প্রয়োজন আল্লাহর মারেফত প্রাপ্ত ও নৈকট্য লাভকারী সাধকদের সুহবত ও তাঁদের পরামর্শ মতে জীবন পরিচালনা করা। মানুষ যেভাবে দৈহিক রোগ-ব্যধির সুচিকৎসার জন্য অভিজ্ঞ ও দক্ষ ডাক্তার খোঁজে বের করে নিজেকে তার নিকট সোপর্দ করে দেয় এবং তার প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী চলে ও বিধি-নিষেধ পুরোপুরি মেনে আরোগ্য লাভ করে; ঠিক তেমনি আত্মিক রোগ-ব্যধির সুচিকিৎসার জন্যও অভিজ্ঞ ডাক্তার খোঁজা উচিত। অন্তরের ভিতর লুক্কায়িত সুক্ষ রোগ-ব্যধির চিকিৎসা নিজে নিজে কোনো ব্যক্তি করতে পারে না। নফস ও শয়তানের ধোঁকা এত সুক্ষ যে, মানুষ নিজে তা বুঝতে পারে না। অনেক সময় এমনও হয় যে, সে যেটাকে ইবাদত মনে করছে সেটাই তার দ্বীনি তরক্কী ও উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায়। এ জাতীয় রোগ-ব্যধি কেবল একজন হক্কানী ও কামিল পীরই ধরতে পারে এবং তার সুচিকিৎসা দিতে পারে।

তাসাওউফ পর্যালোচনা

তাসাওউফ কী ও কেন?

মানুষের শরীরের অঙ্গ-প্রতঙ্গের সাথে যেমন ভাবে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত বিধি-বিধান রয়েছে ঠিক তেমনিভাবে মানুষের আত্মার সাথে সম্পৃক্ত বিধি-বিধানও আছে। শারিরীক বিধানের মতোই ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব যেমন আছে ঠিক তেমনি আছে হারাম, মাকরূহ। এই আত্মিক জগতের পরিশুদ্ধি কিংবা ইসলাহে কলবের নাম হলো তাযকিয়া।

দ্বীনের এই অংশটি অতীতের কোন এক সময়ে “তাসাওউফ” নামে পরিচিতি পেয়ে গেছে। আবার আমাদের উপমহাদেশে তা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে ‘পীর-মুরিদী’ নামে।

যে ইলম অভ্যন্তরীণ সৎ গুণাবলীর বিশদ ব্যাখ্যা এবং তা অর্জনের দিক নির্দেশনা দেয়; অন্তরের রোগ সমূহের বিশ্লেষণ এবং তার চিকিৎসা নির্ধারণ করে তারই নাম “ইলমে তাসাওউফ”।

আর সেসব সৎ গুণাবলী অর্জন এবং আত্মিক রোগ মুক্তির জন্যে একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও হক্কানী বুযুর্গের চিকিৎসা ও তরবিয়তের অধীনে থাকার নাম ‘পীর-মুরীদী’।

তাসাওউফের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

তাসাওউফের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ পাকের মহব্বত, আল্লাহর ভয়, ইয়াকিন, ইখলাস, ইস্তিহযার, ইহসান ও আখলাকে হামিদা অর্জন করা। ইসলামে তাই এর গুরুত্ব অনেক বেশি এবং নিঃসন্দেহে ঈমান ও ইসলামের পূর্ণতাও এগুলোর উপর নির্ভরশীল এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামও অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় উম্মতকে এসব শিখিয়েছেন এবং উৎসাহ দিয়েছেন।

এই তাসাউফ অর্থাৎ ইসলাহে বাতেনকে তথা

আত্ম শুদ্ধিকেই কুরআনের ভাষায় তাযকিয়া বলা হয়। আর

এই তাযকিয়াকেই আল্লাহ তাআলা সফলতার চাবিকাঠি বলেছেন।(সূরা আশ-শামস; আয়াত ৯)

এ তাযকিয়াই আখেরী

নবী মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের প্রেরণের একটি উদ্দেশ্য। (সূরা আলে ইমরান; আয়াত ১৬৪)

সূরা বাকারার ১২৯ নং আয়াত থেকে সুস্পষ্ট যে, কালামে পাকের তেলাওয়াত এবং কোরআন ও হিকমত শিক্ষার

পাশাপাশি তাযকিয়াও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া অালিহি ওয়াসাল্লামের আগমনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত। আর এ তাযকিয়াই তাসাউফের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

সূরা জুমু'আর ৬২ নং আয়াত থেকেই একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইলম ও কিতাব আত্মশুদ্ধির জন্য যথেষ্ট নয়, বরং এর জন্য জরুরী এমন একজন "মুযাক্কী' তথা সংশোধনকারীও, যার তরবীয়ত ও তত্বাবধানে এ দৌলত অর্জন করা যেতে পারে। কারণ শুধু নীতি ও দর্শনগত দিক থেকে কোন বিষয় হাছিল হওয়ার দ্বারা আমলের পূর্ণতা অর্জিত হয় না।

তাই যতদিন কোন রাহানুমা /রাহবার /মুরব্বী/ বয়:জ্যেষ্ঠ অভিজ্ঞ ব্যক্তির অধীনে থেকে আমলী সংশোধনের মাধ্যমে দ্বীনকে অভ্যাসে পরিণত না করবে ততদিন পর্যন্ত অপূর্ণতা থেকেই যাবে।

সুলূক ও তাসাওউফে একজন কামেল শাইখ বা উস্তাদ কিংবা পীরের কাজ এতটুকু যে, কোরান-হাদিসে যেসব বিধানাবলীর তাত্ত্বিক (থিওরিক্যাল) আলোচনা রয়েছে, তিনি সেগুলোকে আমলের রূপদান এবং অভ্যাসে পরিণত করিয়ে থাকেন অর্থাৎ ব্যবহারিক (প্র্যাকটিক্যাল) শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

কোরআন-হাদিস অনুযায়ী একথা স্পষ্ট যে, মানব

জাতির ইসলাহ ও তরবিয়তের জন্য সর্বযুগে দুটি জিনিস প্রয়োজন। তা হলো:

এক- কুরআন ভিত্তিক হেদায়াত।

দুই- তা বুঝা এবং সে মুতাবেক আমল করার যোগ্যতা অর্জনের জন্য শরীয়ত বিশেষজ্ঞ ও আল্লাহ ওয়ালাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ।

একথা শুধু দ্বীনি শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, বরং পৃথিবীর অন্যান্য বিদ্যা এবং শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা পদ্ধতির জন্যও প্রযোজ্য। যেমন : একদিকে থাকবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের নির্ভরযোগ্য পুস্তকাবলী, অন্যদিকে থাকবে বিজ্ঞ ও যোগ্য ব্যক্তিবর্গের তা'লীম ও তরবিয়ত ও দিক নির্দেশনা। তাই সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের অধিকাংশ সময় নববী মজলিসে কাটাতেন। ইসলামি শিক্ষার তরবিয়ত হাতে-কলমে গ্রহণ করতেন। এজন্যই পূর্ববর্তীদের মাঝে শুরু থেকেই বুযুর্গদের সংশ্রব অবলম্বন এবং তাঁদের নসীহত ও ইসলাহের মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার ধারা চলে আসছে।

আত্মশুদ্ধি ও আমলী তরবিয়ত এ পথে যতটুকু সম্ভব, শুধু কিতাবের পৃষ্ঠা উল্টিয়ে তা সম্ভব নয়।

• শাইখুত তা'লীম বা উস্তাদঃ দ্বীনী ইলম যে শাইখ থেকে অর্জন করা হয় তাকে বলে শাইখুত তা'লীম বা উস্তাদ।

• শাইখুত তরবিয়ত তথা পীর বা মুরব্বীঃ যে শাইখ হতে তাযকিয়া ও তরবিয়ত অর্জন করা হয় তাঁকে বলা হয় শাইখুত তরবিয়ত তথা পীর বা মুরব্বী।

কখনো এমন হতে পারে যিনি উস্তাদ তার মুরব্বী হওয়ার যোগ্যতাও আছে। যাহোক, নফসের ইসলাহ ও সংশোধনের জন্যে, তরবীয়তের জন্যে একজন শাইখ কিংবা মুরব্বী এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। একে 'পীর-মুরীদী' বলা হোক কিংবা অন্য কিছু, সেটা মূল প্রতিপাদ্য বিষয় নয়।

মাধ্যম ও উপকরণ

তাসাউফে আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্য যে সকল মাধ্যম ও উপকরণ গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়া হয়, এগুলো প্রধানত দুই ধরনের—

১. কিছু মাধ্যম এমন রয়েছে যেগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কুরআন-হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যেমন : অধিকতর মৃত্যুর কথা স্মরণ করা। মুহাসাবা বা নিজের কাজ কর্মের হিসাব গ্রহণ করা।

২. আবার কিছু মাধ্যম রয়েছে যেগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনোভাবেই কুরআন-হাদীসে বর্ণিত হয়নি। আবার শরীয়তের কোনো বিধানের পরিপন্থীও নয়। বরং হকপন্থী মাশায়েখ-বুযুর্গগণ স্থান-কাল পরিবেশ ও মুরীদের অবস্থার বিচারে সেগুলোর নির্দেশ দিয়ে থাকেন, শরীয়তের কোনো বিধান হিসেবে নয়, বরং শরীয়তের বিধান পালনের মাধ্যম হিসেবে, চিকিৎসা স্বরূপ। যেমন : যিকির করার সময় বিশেষ পদ্ধতিতে মাথা ঝাঁকানো,

বিশেষ পদ্ধতিতে বসা, নির্দিষ্ট সংখ্যায় যিকির করা। এগুলোকে শরীয়তের বিধান বা সুন্নত মনে করা হয় না। কেউ যদি শরীয়তের বিধান বা সুন্নত মনে করে তাহলে সে ভুল করবে। তাসাউফের বরেণ্য ব্যক্তিরা স্পষ্ট ভাষায় এ কথা ব্যক্ত করেছেন। [শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী, মাওলানা ইসমাঈল শহীদ, মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী, হাকীমুল উম্মত থানভী প্রমুখের বক্তব্য পাঠ করুন—'তাসাউফ কিয়া হ্যায়', পৃষ্ঠাক্রম : ৭৪-৭৫; 'তাসাউফ : তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ', পৃষ্ঠাক্রম : ৬৮-৬৯]

তাসাউফের বিশেষ কাজ ও পদ্ধতিগুলো শরীয়তের বিধান পালনের মাধ্যম ও উপকরণ মাত্র, শরীয়তের স্বতন্ত্র কোনো বিধান নয়—এর বিশেষ একটি দিক হচ্ছে, এ কাজ ও পদ্ধতিগুলোতে অভিজ্ঞ শায়েখ ও বুযুর্গগণ স্থান-কাল-ব্যক্তি ভেদে কমবেশি ও পরিবর্তন করে থাকেন। তারা সবার জন্য সব সময় এক পদ্ধতি দেন না। [সিরাতে মুস্তাকিম, ইসমাঈল শহীদ সংকলিত, পৃষ্ঠাক্রম : ৭; তাসাউফ কিয়া হ্যায়, পৃষ্ঠাক্রম : ৭৪ এর বরাতে]

অথচ শরীয়তের বিধান হলে এতে পরিবর্তনের কোনো সুযোগ থাকত না।

তাসাউফের বিশেষ পদ্ধতিগুলো শরীয়তের বিধান না হওয়ার আরেকটি দলীল হচ্ছে, যখন কারো আত্মশুদ্ধি হাসিলে হয়ে যায়, তখন তাকে এই পদ্ধতি মেনে চলতে হয় না। মাওলানা ইসমাঈল শহীদ ও মাওলানা গাংগুহী রহ. বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। —তাসাউফ কিয়া হ্যায়, পৃষ্ঠাক্রম : ৭৩, ৭৫, ৭৬]

এর আরেকটি দলীল হলো, তাসাউফের পদ্ধতি ছাড়া যদি অন্য কোনো বৈধ উপায়ে কেউ আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে পারে, তাহলে এই সুযোগ অবশ্যই তার রয়েছে। আল-কাওলুল জামিলে শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী বলেছেন, কোনো ব্যক্তি যেন কিছুতেই এ ধারণা পোষণ না করে—আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্ক কেবল এই শুগল বা বিশেষ পদ্ধতিতেই অর্জিত হয়! [তাসাউফ কিয়া হ্যায়, পৃষ্ঠাক্রম : ৭৪; তাসাউফ : তত্ত্ব ও পর্যালোচনা, পৃষ্ঠাক্রম : ৭৪]

তাসাউফের এই পদ্ধতি উম্মতে মুসলিমার বিশেষজ্ঞ আলেম, বরেণ্য ফকীহ, স্বীকৃত মুফাসসির ও মুহাদ্দিসগণ প্রণয়ন করেছেন। নিজেরা অবলম্বন করেছেন। এর সমর্থন ও প্রচার করেছেন।

তাসাওউফ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ও অপপ্রচার

মুসলিম সমাজে আরেকটি শ্রেণি রয়েছে যাঁরা ধর্মীয় বিধি-বিধান চর্চা করেন এবং আত্মশুদ্ধির গুরুত্বও উপলব্ধি করেন। কিন্তু আত্মশুদ্ধি অর্জনের স্বীকৃত একটি মাধ্যম তাসাউফ সম্পর্কে অনেক অমূলক ধারণা ও ভ্রান্তি লালন করে থাকেন। এখান থেকে

তাঁরা তাসাউফের ঘোর বিরোধিতায় লিপ্ত হন। তাঁদের তাসাউফ বিরোধিতার মাত্রা এতটাই তীব্র যে, শেষ পর্যন্ত তাসাউফের পথ ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যমকে অবলম্বন করেও তাঁরা আত্মশুদ্ধি অর্জনের পথে অগ্রসর হন না। ফলে এই শ্রেণিটি কার্যতঃ প্রথম শ্রেণির মতো শুধু আকীদা ইবাদতেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। অন্তরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করা, উত্তম গুণাবলি ধারণ করা এবং নিন্দনীয় গুণাবলি থেকে বেঁচে থাকার কোনো প্রচেষ্টা উদ্যোগ তাঁদের কাজকর্মে অনুপস্থিত থেকে যায়।

সামনের আলোচনায় আমরা তাসাউফ সম্পর্কে এ শ্রেণিটির কিছু ভ্রান্তি-ভুল ধারণা এবং তার পর্যালোচনা তুলে ধরছি।

ভ্রান্তি—১ : তাসাউফের কথা কুরআন-হাদীস কোথাও নেই। ফলে এটি ইসলামে নবআবিষ্কৃত একটি বিদআত। সকল বিদআতই পরিত্যাজ্য। ফলে তাসাউফ চর্চা করা কাঙ্ক্ষিত বা বৈধ তো নয়ই বরং সম্পূর্ণরূপে বর্জনীয় বিষয়।

পর্যালোচনাঃ এ ক্ষেত্রে মূল কথাটি হলো, আত্মশুদ্ধি অর্জন করা কুরআন-হাদীসের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রত্যেক মুমিনের জন্য অতীব জরুরি একটি বিধান। যেকোনো মূল্যে এটি অর্জন করতেই হবে। আর তাসাউফ ও তাসাউফের বিভিন্ন কাজ-পদ্ধতি মূলত আত্মশুদ্ধি অর্জনের একটি উপায় ও মাধ্যম।

এটা স্বীকৃত বিষয় যে, উপায় ও মাধ্যমের ক্ষেত্রে শরীয়ত সীমাবদ্ধতার পথ অবলম্বন করেনি। ফলে একে মূল বিধান মনে না করে কেউ যদি 'মাধ্যম ও উপায়' হিসেবে তাসাউফ অবলম্বন করে তাহলে এটি কোনো অবস্থাতেই বিদআত হতে পারে না।

তাসাউফকে আত্মশুদ্ধির একটি মাধ্যম ও উপায় হিসেবে গ্রহণ করলেও যদি বিদআত হয়ে যায়, তাহলে শরীয়তের অন্যান্য মাধ্যম ও উপায়গুলোর ক্ষেত্রেও বড় ধরনের সমস্যা তৈরি হবে। দ্বীন শেখা ও শেখানোর জন্য মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা, ইসলামী বিভিন্ন বিষয়ে স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা, হাদীসের কিতাব সংকলন, হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ের জন্য মূলনীতি উদ্ভাবন প্রভৃতি কোনো কিছুর কথাই তো কুরআন হাদীসে স্পষ্ট শব্দে উল্লেখ করে গ্রহণ করার নির্দেশনা দেয়া হয়নি! তাহলে কি এগুলোকে অস্বীকার করা হবে? বিদআত আখ্যায়িত করে বর্জন করা জরুরি হয়ে যাবে? মূলত কুরআন-হাদীসে বিদআতের যে সংজ্ঞা ও স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে, এ সম্পর্কে অবগত ব্যক্তি মাত্রই এগুলোকে বিদআত ও পরিত্যাজ্য আখ্যায়িত করবেন না।

ভ্রান্তি—২ : তাসাউফের কাজ কর্ম ও পদ্ধতিটি যদি জরুরি হতো তাহলে নবীজি ও সাহাবীর যুগে কেন এসবের অস্তিত্ব ছিল না?

পর্যালোচনা- প্রথম কথা হচ্ছে, হকপন্থী আলেমদের মধ্যে কেউই তাসাউফকে জরুরি ও আবশ্যক বলেন না। যে বিষয়টি আবশ্যক ও জরুরি তা হল, আত্মশুদ্ধি বা তাযকিয়া ও ইহসান।

ফলে তাসাউফের পথ ও পদ্ধতি ছাড়া বৈধ স্বীকৃত অন্য যেকোনো পদ্ধতিতে আত্মশুদ্ধি অর্জন করার পূর্ণ সুযোগ রয়েছে। এ শাস্ত্রের পণ্ডিতগণ স্পষ্ট শব্দে এ কথা ব্যক্ত করেছেন।

দ্বিতীয় কথাটি হলো, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর মহান সাহাবীদের সময়কাল ছিল শ্রেষ্ঠ সময়। নবীজির বরকতময় উপস্থিতি, তাঁর রূহানী শক্তি, সাহাবীদের আত্মিক যোগ্যতা—এসব কারণে আত্মশুদ্ধির জন্য আলাদা কাজকর্ম বা উপায় অবলম্বন করার প্রয়োজন ছিল না। বরং নবীজির শুধু সাহচর্যই এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য যথেষ্ট ছিল।

কিন্তু সময়ের অতিক্রমের সাথে সাথে মানুষ নবীজির যুগ থেকে যতই দূরে যেতে থাকে, তাদের ঈমান-আমলে দুর্বলতা তৈরি হয়। এখন শুধু উত্তম ব্যক্তির সাহচর্য অন্তর পরিশুদ্ধ করতে সক্ষম হয় না। ফলে অভিজ্ঞ আলেমগণ কুরআন-হাদীসের নির্দেশনা ও নিজেদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে বিভিন্ন উপায় ও মাধ্যম প্রণয়ন করেন, যা মানুষকে আত্মশুদ্ধি অর্জনের পথে সহায়তা করতে পারে। তারা আল্লাহ তাআলার অধিকহারে যিকির, ফিকির, মুরাকাবা, নির্দিষ্ট দিনের জন্য নির্জনবাস প্রভৃতি প্রণয়ন করেন।

এই যে প্রয়োজন ও চাহিদা না থাকার কারণে সাহাবীদের সময়ে কোনো বিষয় না থাকা, এর বহু দৃষ্টান্ত ইসলামে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে ইসলামী জ্ঞানঅর্জনের জন্য আরবী ব্যাকরণ, অলংকার শাস্ত্র বা ভাষাজ্ঞান, এর কোনো শাস্ত্রই আলাদা করে অধ্যয়ন করার প্রয়োজন হতো না। জন্মগতভাবেই তাঁরা এগুলো অর্জন করতেন। কিন্তু কালের পরিক্রমায় মানুষের ভাষাজ্ঞান যখন দুর্বল হতে থাকল, তখন কুরআন-হাদীস অধ্যয়নের জন্য এইসব শাস্ত্র প্রণয়ন করা অতীব জরুরি হয়ে উঠল। ফলে মুসলিম উম্মাহর একটি বিশেষজ্ঞ দল এ সম্পর্কিত মূলনীতি প্রণয়ন করলেন। এখন কুরআন-হাদীসের গভীর জ্ঞান অর্জনের জন্য এ সকল শাস্ত্র পড়তেই হয়। যাঁরা ইসলামের গভীর জ্ঞান অর্জন করেছেন, এখন করছেন এবং ভবিষ্যতে করবেন, সবাইকে এই 'মাধ্যম ও উপায়গুলো' অবলম্বন করতেই হবে।

যদিও এই মাধ্যমগুলো শাস্ত্র আকারে নবীজি ও সাহাবীদের যুগে ছিল না। বরং পরবর্তীতে প্রয়োজন ও চাহিদার ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে। তাছাউফের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। সাহাবীদের যুগে তাসাউফের মূল উদ্দেশ্য শুধু নবীজির সুহবতের বরকতেই হাসিল হয়ে যেত। কিন্তু পরবর্তীতে শুধু বুযুর্গ ব্যক্তির সাহচর্যের দ্বারা আত্মশুদ্ধি অর্জিত না হওয়ায়, অতিরিক্ত কিছু কাজ উপায় ও মাধ্যম অবলম্বন করতে হয়েছে।

ভ্রান্তি ০৩-তাসাউফবিরোধীদের একটি অংশের বক্তব্য হলো, তাসাউফের হাত ধরে মুসলিম সমাজে নানা রকম ভুল বিশ্বাস ও ভ্রান্ত আমল-কর্মকাণ্ড প্রবেশ করেছে। এ জন্য তাসাউফ বর্জন করা জরুরি।

পর্যালোচনা-এটি বাস্তব সত্য, যে তাসাউফ ছিল আত্মশুদ্ধি অর্জনের উপায় ও মাধ্যম, যার চর্চা করে মানুষ ঈমান ও আমলে পূর্ণতা অর্জন করত, একশ্রেণের মানুষ সে তাসাউফকে ভুল ও অন্যায়ভাবে ব্যবহার করেছে। তাসাউফের নামে মাজারে মাজারে ওরস, মানত, কবরে সেজদা, গান বাদ্য এবং কুরআন হাদীসের স্পষ্ট নির্দেশনাবিরোধী বিশ্বাস ও কাজের তালীম দেয়া হয়েছে। ফলে এই শ্রেণিটি তাসাউফকে ব্যবহার করে মানুষের মধ্যে যে সকল শিরকি ও বিদআতি বিশ্বাস ও কাজকর্ম ছড়িয়ে দিচ্ছে, তার সাথে হকপন্থী আল্লাহওয়ালা আলেম ও বুযুর্গদের চর্চিত তাসাউফের দূরতম সম্পর্ক নেই। আর এখান থেকেই তাসাউফের দুটি ধারা তৈরি হয়েছে—

১. কুরআন সুন্নাহর নির্দেশনার আলোকে শিরক ও বিদআত মুক্ত তাসাউফ।

২. শিরক ও বিদআত মিশ্রিত তাসাউফ।

এই দ্বিতীয় প্রকার তাসাউসপন্থীরা তাসাউফের নাম ও এর কিছু পদ্ধতির আড়ালে যে শরীয়তবিরোধী কার্যক্রম করে থাকে, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর বিপদজনক ও স্পর্শকাতর। এ বিবেচনায় প্রথম প্রকারের তাসাউফ চর্চাকারী হক্কানী বুযুর্গগণ সর্বদা এই বিষয়ে মানুষকে সতর্ক করেছেন। মানুষ যেন শুধু নাম ও বাহ্যিক কিছু কাজ দেখে ভুল তাসাউফের চর্চায় লিপ্ত না হয়, এ জন্য সূফী=সাধকগণ প্রচুর বই-পুস্তক রচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে মুজাদ্দিদে আলফে সানীর মাকতুবাত, শাহ ইসমাইল শহীদ রহ. সংকলিত সিরাতে মুস্তাকিম, রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ.-

এর মাকতুবাতে রশিদিয়া, হাকীমুল উম্মত থানভী রহ.

লিখিত তাকাশশুফ, তাশাররুফ, কাসদুস সাবিল, মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব

রচিত তাসাউফ তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ-জাতীয় পুস্তকে কুরআন-সুন্নাহসম্মত তাসাউফ বর্ণনার

সাথে সাথে তাসাউফের নামে চর্চিত ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতাগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বস্তুতঃ তাসাউফকে বিকৃতি ও ভ্রান্ত ব্যক্তিদের হাত থেকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা সবসময় ছিল, এখনো চলমান রয়েছে। কিন্তু কিছু মানুষ কর্তৃক তাসাউফের ভুল ব্যবহার ও বিকৃতির কারণে মূল তাসাউফকেই বর্জন করতে হবে, এটি একেবারেই অযৌক্তিক দাবি। কেন অযোক্তিক? এর একটি বিশেষ দিক হচ্ছে, এমন ভুল ও বিকৃতির হাত থেকে ইসলামের বেশির ভাগ শাস্ত্র ও শাখাই নিরাপদ ছিল না। হাদীস শাস্ত্রের ইতিহাসের দিকে তাকান। এক্ষেত্রে এমন কিছু মানুষ পাওয়া যাবে, যারা জাল হাদীস তৈরি করত এবং মানুষের কাছে বর্ণনা করত। হাদীস নিয়ে তাদের এমন অন্যায়ের কারণে মুহাদ্দিসগণ সমস্ত হাদীসকে বর্জন করেননি। বরং ভুল ও

জাল হাদীসকে বাদ দিয়েছেন। এসব নির্ণয় ও যাচাই করার জন্য নতুন নতুন শাস্ত্র আবিষ্কার করেছেন।

তাফসীর শাস্ত্রে দেখুন, এখানেও একই কথা প্রযোজ্য। তাফসীরের অনেক কিতাবে অগ্রহণযোগ্য বর্ণনা ও বক্তব্য এসে গেছে। তবে বিজ্ঞ মুফাসসিরগণ ভুল-শুদ্ধ নির্ণয় করে সঠিক ও যথাযথ বক্তব্য তুলে ধরেছেন। ইসলামী ফিকহশাস্ত্র, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ও এ বাস্তবতার ব্যতিক্রম ছিল না।

সবচেয়ে বড় কথা হলো, এই বাস্তবতা শুধ ইসলামী জ্ঞানের ক্ষেত্রে নয়, আমাদের দৈনন্দিন জীবন চলার পথে সর্বত্র এই ভালো-মন্দ সঠিক ও ভুলের মিশ্র উপস্থিতি দেখতে পাই। রোগীর চিকিৎসা করেন যে ডাক্তার শ্রেণি তাদের মধ্যে কি দক্ষ ও অদক্ষ, স্বীকৃত ও ভুয়া দুই রকম ডাক্তার নেই? ইঞ্জিনিয়ার থেকে শুরু করে উকিল-শিক্ষক সবশ্রেণির মধ্যেই এই মিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায়।

মূল কথা হলো, ভালো মন্দের এই মিশ্রণের কারণে আমরা মন্দের সাথে সাথে ভালো ও যোগ্যদের বর্জন করি না। বরং সর্বোচ্চ যাচাই বাছাই ও পর্যবেক্ষণ করে ভালো ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার শিক্ষককে গ্রহণ করি।

এই যাচাই বাছাই ও পর্যবেক্ষণের কাজটি আমরা আত্মশুদ্ধির মাধ্যম তাসাউফের ক্ষেত্রে কেন করব না? এক শ্রেণির মানুষ ভুল ও অন্যায়ভাবে একে ব্যবহার করছে, এ কারণে কি আমরা মূল তাসাউফকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করতে পারি? সন্দেহ নেই, এটি অন্যায় কাজ এবং প্রকৃতপক্ষে এর অধিকারও আমাদের নেই।

ভ্রান্তি—০৪ : তাসাউফ সম্পর্কে প্রচলিত আরেকটি ভ্রান্তি হলো, অনেকে মনে করেন— তাসাউফের কারণে মানুষ কর্মবিমুখ হয়ে যায়। জীবন জগৎ সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক ধরনের 'সন্ন্যাস' গ্রহণ করে। একইভাবে যারা তাসাউফ চর্চা করেন তারা দ্বীনী শিক্ষার প্রচার-প্রসার, দ্বীনী আন্দোলন-সংগ্রাম-জিহাদ-জিহাদ থেকে সব সময় নিজেদের দূরে রাখেন। তাঁরা খানকাহতে এক ধরনের আবদ্ধ জীবন যাপন করেন। এ ধারণা পোষণকারীগণ তাসাউফকে দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথে বাধা ও অন্তরায় মনে করেন। মানুষ যেন কোনোভাবেই তাসাউফের কাছেও না যায় এ বিষয়ে দীর্ঘ সতর্কবাণী তাঁরা প্রচার করে থাকেন।

পর্যালোচনা- এ আপত্তিটি যদিও প্রতিষ্ঠিত অনেক লেখক ও চিন্তক উত্থাপন করেছেন, কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য ও বাস্তবতার মানদণ্ডের বিচারে এটি একেবারেই অগ্রহণযোগ্য দাবি। মূলত এ ভ্রান্তির পেছনে দায়ী হলো, তাসাউফের সঠিক চর্চাকারী হক্কানী বুযুর্গদের সংস্পর্শে না যাওয়া, তাসাউফের মূল উৎসগ্রন্থ থেকে এর পরিচয় ও স্বরূপ না জানা,

বরং তাসাউফের দাবিদার কিছু ভ্রান্ত লোকদের কর্মকাণ্ড দেখেই ধারণা ও অনুমান থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

বিগত কয়েক শতকের ইসলামী ইতিহাসের দিকে তাকালে আমাদের সামনে যে সত্যটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তা হলো, এই দীর্ঘ সময়ে ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষার প্রচার-প্রসার, দ্বীনী ইসলাহী আন্দোলন-সংগ্রাম ও জিহাদ যা কিছু হয়েছে, এর প্রধান ও মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন সেসকল ব্যক্তিবর্গ যাঁরা শুধু নিজেরা তাসাউফ চর্চা করতেন তা-ই নয় বরং তাসাউফের জোরদার সমর্থক ও প্রচারকও ছিলেন।

তাসাউফের সাথে দ্বীন প্রতিষ্ঠার এই গভীর সম্পর্কের রহস্য মাওলানা নদবী রহ. অন্য একটি রচনায় তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন দ্বীনের জন্য কুরবানী, আত্মত্যাগ, জিহাদ—এই সবকিছুর জন্য যে পরিমাণ রূহানী শক্তি ও ইখলাসের প্রয়োজন হয় অনেক সময় এই শক্তি আত্মিক পরিশুদ্ধি, অন্তরের পরিশীলন, মুজাহাদা ও ইবাদত ছাড়া অর্জিত হয় না। [তাসাউফ কিয়া হ্যায়, পৃষ্ঠাক্রম : ১১৩]

মূলত তাসাউফ যদি সুন্নতমাফিক হয়, সঠিক উদ্দেশ্য ও পদ্ধতিতে চর্চিত হয় তাহলে এই তাসাউফ মানুষের মধ্যে কর্মশক্তি ও মনোবল তৈরি করবে। জিহাদ ও শাহাদতের প্রতি অদম্য স্পৃহা সৃষ্টি করবে।

তাসাউফ সম্পর্কে কর্মবিমুখতা ও পলায়ন-পরতার যে অভিযোগ বা বিভ্রান্তি এর কারণ সম্পর্কে আরেকটি বিষয় পরিষ্কার করতে চাই। আমরা আগেও দেখিয়েছি অনেকেই তাসাউফের ভুল চর্চা করেছেন। তাঁদের একটি অংশ তাসাউফ চর্চা করতে গিয়ে জীবন জগৎ থেকে নিজেদের গুটিয়ে মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। এটা তাঁদের নিজস্ব উপলব্ধি ও অবস্থান। কিন্তু এর বিপরীতে তাসাউফের সমর্থক প্রচারক ও বুজুর্গদের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে যাঁরা আমৃত্যু দ্বীনী কর্মতৎপরতায় নিজেদের ব্যস্ত রেখেছেন। মানুষের মধ্যে ইসলামী শিক্ষা বিস্তার, দাওয়াত ও তাবলীগ, জিহাদ, রাজনীতি—সবকিছু একাধারে সমানভাবে করে গেছেন। ফলে তাসাউফ চর্চাকারীদের একটি অংশের ভুল কর্ম পদ্ধতিকে অবলম্বন করে পুরো তাসাউফকে সেই দোষে দুষ্ট করা, ঢালাওভাবে নেতিবাচক বক্তব্য প্রচার করা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

তাসাউফ সম্পর্কে এমন ঠুনকো ও অযৌক্তিক আরো সমালোচনা সমাজের একটি শ্রেণির মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু একজন সত্যসন্ধানী মানুষের করণীয় হলো, সমালোচনাগুলোকে বাস্তবতার মানদণ্ডে যাচাই না করে অন্ধভাবে গ্রহণ না করা।

উপসংহার

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا.

অবশ্যই সে সফল হয়েছে, যে নফসকে পরিশুদ্ধ করেছে। আর সে ব্যর্থ হয়েছে, যে তা বিনষ্ট করেছে। —[সূরা শামস (৯১) : ৯-১০]

প্রতিটি মানুষের জীবন ও ব্যক্তিত্বের প্রাথমিক প্রকাশ ঘটে থাকে তার নৈমত্তিক কাজকর্মে। একান্ত আলাপচারিতা, ব্যক্তিগত পর্যায়ে দেওয়া উপদেশ ও পরামর্শ, জনসম্মুখে দেওয়া ভাষণ ও বিবৃতি এবং নিজস্ব জীবনাচার ও বিভিন্ন পর্যায়ে কৃত লেনদেনে একজন মানুষের সাধারণ পরিচয় ফুটে ওঠে। স্পষ্ট হয় তার চিন্তা, রুচি, দৃষ্টিভঙ্গি ও মন মানসিকতা। তবে এর মূলে যে প্রভাব ও ভূমিকা থাকে তার কেন্দ্রবিন্দু হল মানুষের নফস ও কলব, তথা হৃদয় ও অন্তর। সেখানেই মানুষের ভাব ও ভাবনা লালিত—পালিত হয়। বোধ ও বিশ্বাসের চর্চা-পরিচর্যা হয়। এককথায় মানুষের বাহ্যিক জীবনের মৌলিক বিষয়গুলো তার একান্ত ভেতর থেকেই পরিচালিত হয়। তাই কুরআন ও হাদীসে মানুষের বাহ্যিক জীবনকে যেমন সুন্দর ও নিয়মসিদ্ধ করার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, অভ্যন্তরীণ অবস্থাকেও পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করার প্রতি জোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু দেখা যায়, নানা স্তর ও পর্যায়ে মানুষ বাহ্যিক জীবনকে সুন্দর করার চেষ্টা করলেও অভ্যন্তর সুন্দর করার ক্ষেত্রে অনেক অবহেলা করে। এমনকি কথিত সচেতন সমাজের বড় একটি অংশজুড়ে কেবল বাহ্যিক আচরণ-উচ্চারণের সৌন্দর্যকেই প্রধান বিবেচ্য বলে মনে হয়। অথচ সকলের কাছেই স্বীকৃত এবং অনস্বীকার্য বাস্তবতা হল, বাহ্যিক জীবনাচারের সৌন্দর্য কোনোভাবেই প্রকৃত জীবনসৌন্দর্য হতে পারে না। অভ্যন্তরীণ শুদ্ধি ও পরিশুদ্ধি থেকে উৎসারিত আচরণিক সৌন্দর্যই প্রকৃত সৌন্দর্য। কুরআন মাজীদে উল্লেখিত এ বিষয়ক আয়াতগুলো যেমন মুগ্ধ হবার মতো, তেমনি ভাবনা ও ফিকির উদ্রেককারী।

মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো আত্মশুদ্ধির জন্য সক্রিয় হওয়া। ইমাম ইবনে কাসীর বলেন, যে ব্যক্তি আত্মাকে পরিশুদ্ধ করবে আল্লাহ তাকে অনুগ্রহ করবেন ও সম্মান দিবেন। যদি বান্দার ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকতো তাহলে কেউ পরিশুদ্ধি অর্জন করতে পারতে না।' আখিরাতে জান্নাত তো তাদের পুরস্কার যারা নিজকে সংশোধন করতে পেরেছে। ইরশাদ হচ্ছে-

وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْعَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى-
جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاء مَن تَزَكَّى

অর্থাৎ 'যারা মুমিন হয়ে ও নেক কাজ নিয়ে তাঁর কাছে আসবে, তারা হচ্ছে সেসব লোক যাদের জন্য রয়েছে সুউচ্চ মর্যাদা। আর সে মর্যাদা হলো এমন স্থায়ী জান্নাত যার পাশ

দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এ হচ্ছে সে ব্যক্তির পুরস্কার যে নিজকে পরিশুদ্ধ রেখেছে।'

আত্মশুদ্ধি ইসলামী জীবনের একটি অপরিহার্য অনুশীলন, যা একজন মুমিনের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির মূল চাবিকাঠি। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন, 'নিশ্চয়ই সে সফলকাম হয়েছে, যে তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে' (আশ-শামস, ৯১/৯)। এই আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জনের জন্য কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর নির্দেশিত পথে চলা আবশ্যক। তওবা, ইখলাছ, তাক্বওয়া, ধৈর্য, যিকির ও কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ সম্ভব। আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে আমরা আমাদের অন্তরকে কলুষতা থেকে মুক্ত করে জান্নাতের পথ প্রশস্ত করতে পারি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে এই মহান গুণ অর্জনের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন।

তথ্যসূত্র

- *আত্মশুদ্ধি*, মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ., মাকতাবাতুল আশরাফ, ঢাকা (১৭তম মুদ্রণ, মার্চ ২০২৩)।
- *তাসাওউফ: তত্ত্ব, অনুসন্ধান ও করণীয়*, মাওলানা মুহাম্মাদ নুমানী রহ., মাওলানা মু হাম্মাদ ওয়ারেস নদভী রহ., মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদ্ভী রহ., মাক তাবাতুল ফুরকান, ঢাকা (মে ২০২২)।
- *বাছায়েরে হাকীমুল উম্মত*, হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই আরেফী রহ., মাকতাবাতুল আশরাফ, ঢাকা (তৃতীয় মুদ্রণ, ২০২০)।
- *তাসাওউফ ও আত্মশুদ্ধি*, মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী, মাকতাবাতুল আশরাফ, ঢাকা (সেপ্টেম্বর ২০২৪)।
- *তাযকিয়া: পথ ও পদ্ধতি*, মুহাম্মাদ আদম আলী, মাকতাবাতুল ফুরকান, ঢাকা (২০২ ৩)।
- *আত্মার ব্যাধি ও প্রতিকার*, মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব রহ., হা কীমুল উম্মত প্রকাশনী, ঢাকা (ডিসেম্বর ২০০৮)।
- *রাহে বেলায়েত*, ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ., আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ঝিনাইদহ/ঢাকা (সেপ্টেম্বর ২০২১)।

- *তাসাওউফ : তত্ত্ব ও পর্যালোচনা*, মাওলানা আব্দুল মালেক, মাকতাবাতুল আশরাফ, ঢাকা।
- *কসদুস সাবীল*, মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ., মাকতাবাতুল ফুরকান, ঢাকা (মে ২০২২)।
- *সহীহ হাদীসের আলোকে তাসাওউফ*, হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ., মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা (সেপ্টেম্বর ২০১৪)।
- *তাযকিয়াতুন নাফস*, ড. আহমদ আলী, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা (ফেব্রুয়ারি ২০১৮)।
- https://www.alkawsar.com/bn/
- https://at-tahreek.com/
- https://al-itisam.com/
- https://lifewithallah.com/category/articles/
- https://riwayahbd.com/
- https://old.anjumantrust.org/category/%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%ac%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a7/
- https://sakeenaacademy.com/blog/
- Egypt's Dar Al-Ifta | Excellence is all about “Self-Puri... https://share.google/v8XNPxeEua29ilyub
- The Purification of the Self (Tazkiyat al-Nafs) — samirmahmoud.com https://share.google/ObhCBQsqoPJIablGR
- তাজকিয়া - উইকিপিডিয়া https://share.google/N45hgCLfp8uvDRfsh
- Tazkiyah: Purification/Sanctification - https://share.google/gsDxcFg936INNZJgp
- কুরআন ও সুন্নাহ | আল-কুরআন, তাফসীর ও হাদীসের গ্রন্থ | Quran and Hadith https://share.google/7FjxHhLHR1ayiZPUg
- আত্মশুদ্ধি কোন পথে? https://share.google/UMrYqquI1AmHtjvcX
- The Need for Self Purification - আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা https://share.google/J4dqUjovtVPxuQgHQ
- TazkitunNufus.pdf https://share.google/CeIp68UbCJdsptnez

- ইসলামী বিশ্বকোষ https://share.google/lxipNiCtHfV7EXuWl
- https://youtube.com/playlist?list=PLVu93aailZ6VO8YfWZb28KuHoCJdjukhC&si=GsX-ZURTpa3mlmD_
- https://youtu.be/2nZJ-FLI1cY?si=48vq5bgpbMXIVG-Q
- https://youtu.be/sTmOOAWN2Go?si=A7fP1QOlwQHlJpUz
- https://youtu.be/sTmOOAWN2Go?si=MhI0N78Q3tJZRy2Y
- https://youtu.be/tbtQFlwPMMI?si=JiT1Fm1u4pjgc0TR
- https://youtube.com/playlist?list=PL7E7DFtKYTnaE6G5kWHiM4K55dqUMkKMk&si=vxrDOFrwgPuVo-Zq